কল্লোল রায়

প্রথম মহাযুদ্ধের রোমাঞ্চকর গুপ্তচরদের কাহিনী

স্বর্ণাচল প্রকাশক,

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৫৯

স্পাই

প্রথম মহাযুদ্ধের গুপ্তচরদের গল্প

প্রকাশক

নরেন্দ্র দে

পূর্বাচল প্রকাশক

৬, কলেজ-রো, কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর

দেবেন্দ্রনাথ নাথ

বাসন্তী আর্ট প্রেস

৬-১, কলেজ-রো, কলিকাতা—৯

বাঁধিয়েছেন

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নবীন [illegible], [illegible]

৬, কলেজ-রো, কলিকাতা—৯

স্পাই

মূল্য : তিন টাকা

কথা-পূর্ব

রাষ্ট্রনীতি ও রণবিজ্ঞান উভয়বিধ শাস্ত্রেই গুপ্তচরের অসীম প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়ে থাকে। রাজ্যশাসন ও যুদ্ধের ব্যাপারে সুশিক্ষিত আরক্ষা ও সৈন্যবাহিনীর মতই কুশলী গুপ্তচরের প্রয়োজন অপরিহার্য।

এ বিষয়ে চরবিদ্যা-বিশারদরা অর্থাৎ সুশিক্ষিত গুপ্তচর যাঁরা তৈরী করেন রাষ্ট্ররক্ষার তাগিদে, তাঁরাই অনেক কথা বলতে পারেন। কোনো দেশ থেকেই এ বিষয়ে সরকারীভাবে কিছু প্রকাশ করা হয় নি বা হয় না। আমি শুধু এ কথাই বলতে পারি যে রামায়ণ ও বাইবেলের যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত গুপ্তচর-প্রথা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রেই অপরিহার্য পদ্ধতিরূপে অবলম্বিত হয়ে এসেছে। বিভীষণ ও কুইজলিং, ডিলাইলা ও মাতাহারি—একই ঐতিহ্যের বাহক।

আমাদের পুরাণগুলিতে দেবতা ও রাজাদের যুদ্ধজয় ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনীগুলি গুপ্তচর-উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের রাজারা 'চার-চক্ষু' নামে অভিহিত হতেন। রামায়ণে আছে, যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান সর্ব্বানর্থান নরাধিপাঃ। চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানশ্চারচক্ষুষঃ॥ (গোরেসিয়োর রামায়ণ, ৩-৩৭-৯)। অর্থাৎ যেহেতু রাজগণ দূরস্থিত পদার্থসমূহ চারের (চরের) দ্বারা দেখেন, সেজন্য তাহাদের 'চারচক্ষু' বলা হয়।

মনু-সংহিতায় চরের কার্যাবলীর বর্ণনাও রয়েছে: দূত সম্প্রেষণঞ্চৈব কার্য্যশেষং তথৈব চ। অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্॥ (মনু, ৭-১৫৩) অর্থাৎ দূতকে পররাজ্যে কিরূপে প্রেরণ করা যায়, যে কাজ আরব্ধ হয়েছে অথচ শেষ হয় নি, তাহা কিরূপে পরিসমাপ্ত করা যায় স্ত্রীলোকদের ব্যবহার সখ্যাদি দ্বারা কিরূপে অবগত হওয়া যায়, পররাজ্যে যে সকল চর নিযুক্ত করা হয়েছে, চরান্তর দ্বারা কিরূপে তাদের কাজ জ্ঞাত হওয়া যায়, রাজা এসকল বিষয়ে চিন্তা করবেন।

প্রাচীন ভারতে গুপ্তচরদের পাঁচ ভাগে শ্রেণী বিন্যাস করা হতো—এরই নাম পঞ্চবর্গ, যথা, কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতি-ব্যঞ্জন, বৈদেহিক-ব্যঞ্জন ও তাপস-ব্যঞ্জন। কপট ছাত্ররূপে নিযুক্ত চরের নাম কাপটিক, সন্ন্যাসী গুপ্তচরদের নাম উদাস্থিত, কৃষকরূপে যারা চরের কাজ করতো তাদের বলা হতো গৃহপতি-ব্যঞ্জন, বনিকবেশী চরের নাম বৈদেহিক ব্যঞ্জন আর কপট ব্রহ্মচারীরূপী গুপ্তচরদের আখ্যা দেওয়া হতো তাপস ব্যঞ্জন বলে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই সাধ্যমত গুপ্তচর বাহিনী গঠন করে থাকে। জরুরী অবস্থায় অর্থাৎ আপৎ-কালে এই বাহিনীর ওপর নির্ভরতা বাড়ে। অতীত ইতিহাস প্রমাণ করেছে একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যের একটা বাহিনীর চাইতেও একজন মাত্র কুশলী গুপ্তচরের মূল্য অনেক বেশী হতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থে কেবলমাত্র এই শতাব্দীর প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের গুপ্তচরদের গল্প দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকারা সকলেই সত্যিকার চরিত্র—ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর দিয়ে সবাই হেঁটে গেছে। কয়েক দশক আগে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় জীবনের রংগমঞ্চে এরা স্বীয় ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে। ইতিহাস আজ গল্প হয়ে উঠেছে এদের নিয়ে।

পুস্তক-প্রণয়নে পুরাতন ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ও বহু বিদেশী গ্রন্থের সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। কয়েক স্থানে ইংরাজী বই থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করেও বসিয়ে দিয়েছি। সব মিলিয়ে বলা চলে সংকলন ও সম্পাদনার কাজ করতে হয়েছে আমাকে।

জন্মাষ্টমী, ১৩৫৯

কল্লোল রায়

সূচীপত্র

● মাতাহারি

মাতাহারি

মাতাহারি। অদ্ভুত এই নাম। একসময় এই নাম সচকিত করে তুলেছিল অর্ধেক পৃথিবী। প্রথম মহাযুদ্ধের সেরা গুপ্তচর মাতাহারি। প্যারীর অভিজাত শ্রেণী ও ফ্রান্সের সেনানীমহলকে দিনের পর দিন বিভ্রান্ত করেছিল এই নারী। মন্ত্রীসভার সদস্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে সামান্যতম সৈনিক এই রহস্যময়ী নারীর সৌন্দর্যের অগ্নিশিখায় পতংগের মত আকৃষ্ট হতো। এই গর্বোন্নত নারীর এক টুকরো মদির হাসির লোভে তার চতুর্দিকে মুগ্ধ ভক্তদের অবিশ্রান্ত ভিড় জমে থাকতো।

সাধারণত কোনো গুপ্তচরের বেলায় জনসাধারণের মনোভাব যেভাবে প্রতিফলিত হয়, মাতাহারির ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখা গিয়েছিল। ইউরোপ আমেরিকায় এই মহিলাটিকে নিয়ে এত বেশী আলোড়ন হয়েছে, যা অন্য কোনো গুপ্তচরের বেলায় হয়নি। বিশেষ করে যে দেশগুলির বিপক্ষে তার কার্যকলাপ নিয়োজিত ছিল, সেখানকার জনসাধারণই মাতাহারির সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উৎসুক ও সমবেদনাপরায়ণ ছিল। গুপ্তচর হিসেবে মাতাহারি ছিল অনন্যা। শ্রেণীবিভাগ করলে মাতাহারিকে যে পর্যায়ে ফেলা যায়, বোধ হয় আধুনিক কালের ইতিহাসে সেখানে দ্বিতীয় কাউকেই পাওয়া যায় না। মাতাহারি শেষ অবধি তার চতুষ্পার্শ্বে যে রহস্যের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে গেছে, তার সংগে তার দৈহিক অপূর্ব সৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম শিল্প-মানস মিশে তাকে তার পর্যায়ে একক অসাধারণ করে তুলেছে।

মাতাহারির প্রধান কর্মক্ষেত্র প্যারী। প্যারীর শিল্প-বোধ, রস-পিপাসা তাকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। দ্যুতিসম্পন্ন রূপলাবণ্য, রোমান্টিক আশ্লেষ, সূক্ষ্ম মনন আর রোমাঞ্চকর কিছু, হৃদয়াবেগ ও কবিতার প্রতি অদম্য আকুতি, যেগুলি থাকলে নাট্যকার ও লেখকদের যথার্থ নায়িকা হয়ে ওঠা যায়, তার সবগুলি ছিল এই নারীর মধ্যে। লোকমুখে, ফিল্ম ও মঞ্চ-নাটকের মাধ্যমে বাস্তব ও কল্পনার ইন্দ্রজালে মাতাহারি তাই হয়ে উঠেছে রহস্য-লোকের কন্যা, যার বিচরণ অনুভূতিময় মিষ্টিসিজ্‌মের অন্তরালে।

মোহনীয় রাত্রির প্যারীর প্রাণকে উজ্জীবিত, অতীন্দ্রিয় সুখাবেশে বিভোর করে তুলতো মাতাহারি। রাজপুত্রের জীবন যেমন ছিল রাক্ষসীর কৌটোয়, মাতাহারি যেন তেমনি করে বিদগ্ধ ফ্রান্সের বিভ্রান্ত বিমুগ্ধ আত্মাকে বন্দী করে রেখেছিল।

মাতাহারির জীবন-বৃত্তে ফরাসী সামরিক অফিসার ও বেসামরিক রাজকর্মচারীদের অনেকেরই ছিল মগ্ন পরিক্রমা। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের এই কলংকের বহু অপ্রকাশিত তথ্য আজো জমা হয়ে আছে লালফিতার বাঁধনে। এ-সম্পর্কে ফরাসী কর্তৃপক্ষ যেমন নীরব, তেমনি উদাসীন মাতাহারির নিয়োগ-কর্তা জার্মান গভর্ণমেণ্ট।

প্যারীর সুরম্য পল্লীর সুন্দর একটি অট্টালিকায় সব চাইতে ভালো ঘরটিতে মাতাহারি তার ধর্মচক্রের অনুষ্ঠান করতো। বাছা বাছা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হতেন সেখানে। মৃদু রঙীন আলো, অগুরু-চন্দন ও ধূপের সৌরভে কক্ষে সৃষ্টি হতো মনহরণের পরিবেশ। মহার্ঘ খাদ্য ও পানীয় সম্মোহিত করে রাখতো অতিথিদের। সেই অর্ধালোকিত ঘরে মাতাহারি শিব ও সর্প নৃত্য প্রদর্শন করতো। তারপর হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু তত্ত্ব শোনাতো রূপলুব্ধ মূঢ়

প্রেমিকদের। বলাবাহুল্য এসব সে আয়ত্ত করেছিল প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ থেকে।

এরপর শুরু হতো তার জীবনচরিতোপাখ্যান। চরিতার্থ হতো তার ভক্তজন, যখন সে সম্মুখের কোচে আলস্য-মন্থর দেহ শিথিল করে অর্ধ-শয়নের ভংগীমায় নিস্তব্ধ কক্ষে মৃদু স্বরে আত্মকাহিনী বিবৃত করতো।

ভক্তদের কাছে মাতাহারির নিজের মুখে বলা কাহিনী হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম। জন্মের পরই তাকে শিবের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে তার জীবন উৎসর্গ করা হয়। যাতে উপযুক্ত দেবদাসী হতে পারে এই অভিপ্রায়ে বাল্যকাল থেকেই তাকে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে।

'তারপর যখন আমার যৌবন প্রস্ফুট হয়ে উঠলো, আমার পালিকা-মাতা স্থির করলেন আগামী বসন্তে শক্তিপূজার রাত্তে আমার নিকট উন্মোচন করে দেবেন প্রেম ও বিশ্বাসের রহস্য-দ্বার। তেরো বছর বয়সে দেব-দেউলের পাষাণ-চত্তরে সেই প্রথম আমি সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে নৃত্যরতা হলাম।'

তারপর সেই মন্দিরে একদিন এলো এক ইংরেজ। নৃত্য পটীয়সী এই মেয়েটীকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে করলো বিবাহ। তারপর তাদের হলো একটী সন্তান—দুর্ভাগ্যবশত ছেলেটীকে তাদের ভৃত্য বিষপ্রয়োগে হত্যা করে, ফলে মাতাহারি ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃত্যটিকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল।

মাতাহারির মুখাবয়ব ছিল প্রাচ্য দেশবাসীদের মত। তার গল্প বলার ভংগীটাও ছিল ভারতীয়দের মত। তাই ভক্তরা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে ডাচ মহিলাটিকে মনে করতো ভারতীয় বলে। গ্রেপ্তারের

পরে মাতাহারির নিজের উক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি ও তার মায়ের লেখা জীবনী থেকে জানা গিয়েছিল ১৮৭৬ সালের ৭ই আগষ্ট হল্যাণ্ডের লিউওয়ার্ডেন শহরে মার্গারেট গারট্রুড জেলের জন্ম হয়। অনেকের মতে, মাতাহারির পিতামাতা যখন যবদ্বীপে ছিলেন সেই সময়েই তার জন্ম হয়েছিল। স্কুলের জীবনে মার্গারেট ভালোই ছিল। আঠারো বছর বয়সে হেগে বেড়াতে এসে ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল ম্যাকলিওড নামক একজন সামরিক ব্যক্তিকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। সামরিক কর্মচারীদের তার কি ভালোই না লাগতো। যে কোনো সামরিক অফিসারকে দেখামাত্রই ভালো লাগার কথা মার্গারেট স্বীকার করেছে বহুবার। অফিসাররা ওর কাছে ছিল যেন একটা স্বতন্ত্র জাতি। যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, যুদ্ধের আহ্বানের জন্য প্রশান্তভাবে প্রতীক্ষা করছে এমন ব্যক্তিদের বাহু-কবলিত হবার লালসা ছিল মার্গারেটের মনে।

ক্যাম্পবেল ম্যাকলিওডের সংগে মার্গারেটের বিবাহ হলো। স্বামী সমর বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হওয়ায় প্রথামত রাজ-দরবারে স্ত্রীকেও সংগে নিয়ে যেতেন। মার্গারেট স্বামীর সংগে প্রথম রাজ সন্দর্শন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। নিজের অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা স্মরণ করে বোধ হয় সেই সময় থেকেই তার মনে এই গোপন ইচ্ছাটা পরিপুষ্ট হয়েছিল যে রাজা ওমরাহরাও যেন তাকে এমনি করে সম্ভ্রম জানায়।

মার্গারেটের মনে এমনি উচ্চাশা দিনে দিনে বর্ধিত হতে থাকে। কিন্তু একজন মিলিটারী অফিসারের সান্নিধ্যে তার দুরাশা সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই সে দেখতে পায়নি। মার্গারেট বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করলো। ফলে অসন্তুষ্ট ম্যাকলিওড তার পুত্রটিকে নিয়ে অন্য এক বাড়ীতে চলে গেলেন। মার্গারেট রইলো একলা তার দ্বিতীয় সন্তান কন্যাটিকে নিয়ে।

সহসা একদিন কোর্ট থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হলো। মার্গারেট বিস্মিত হয়ে দেখলো ম্যাকলিওড তার বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের যে আলাদা দরখাস্ত করেছিলেন, মঞ্জুর হয়েছে সেইটিই আর তা মার্গারেটের একান্ত প্রতিকূলেই। অকস্মাৎ বিলাসিনী নারী সৌধশিখর থেকে নেমে এলো রিক্তের পর্ণকুটিরে। উত্তর সমুদ্রের ঘন কুজ্ঝটিকার আবর্তে হারিয়ে গেল ক্যাম্পবেল ম্যাকলিওড আর মার্গারেট গার্ট্রুড। তারপর একদিন দেখা গেল প্যারীর রংগমঞ্চে 'লাল নর্তকী' মাতাহারিকে।

ফ্রান্সের আভিজাত্যকে উন্মাদ করে দিল মাতাহারি। কিই বা সে নাচে—ইসাডোরা ডানকানের সংগে তার কিছুমাত্র তুলনা চলে না। তবু এই নারী হেলায় জয় করলো বিলাসী জনগণমন-সাম্রাজ্য। সমালোচকরা বলেছে, নৃত্যকলার খুঁটিনাটি জ্ঞান ছিল না মাতাহারির। তার অবয়বের সৌন্দর্যে ত্রুটিও ছিল—প্রধান ত্রুটি তার বুক—মোটা আর চওড়া আর নিম্নগামী, যার জন্য সে শুধু বক্ষোদেশ ঢেকে রাখতো তা নয়, বুকের দিকে যাতে লোকের দৃষ্টি না পড়ে সেজন্য সচেষ্ট থাকতো। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর জীবিকার সন্ধানে মাতাহারি যখন একবার কোন শিল্পীর কাছে মডেল হবার জন্য ধর্না দিয়েছিল, তখন তার বুকের ত্রুটির জন্যই শিল্পী তাকে বিশেষ উৎসাহিত করতে পারেনি।

নর্তকীরূপে খ্যাত হবার পর থেকেই মার্গারেট নিজের যথার্থ পরিচয় গোপন করে নিজেকে ভারতীয় হিন্দু ও প্রাচ্য আদর্শের পূজারিণীরূপে প্রচার করতে শুরু করে। আশ্চর্যের কথা, প্রাচ্যের বহু বিষয়ে তার জ্ঞানের অপূর্ণতা সত্ত্বেও বিমুগ্ধ জনসাধারণ তাকে বিশ্বাস করেছিল।

ফ্রান্সের উঁচু তলার সমাজ জয় করবার পর মাতাহারি বার্লিনে যায় নাচ দেখাতে। জার্মান পুলিশের কড়া নজর ছিল নর্তকী বা বা অভিনেত্রীদের পরিচ্ছদের শালীনতার ওপর। মাতাহারি এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবেই অপরাধী হয়ে বার্লিন পুলিশের কর্তার সম্মুখীন হয়। শীঘ্রই দেখা যায় উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ঘটেছে এবং মাতাহারির জন্য পুলিশ সুন্দর একটী বাস-ভবন জোগাড় করে দিয়েছে।

সেই সময়ই জার্মান সিক্রেট সার্ভিস তৎপরতার সংগে মাতাহারিকে গোপন বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল। বিদেশী পদস্থ ব্যক্তিদের প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে এনে মাতাহারি তার আড্ডাখানায় এমন সব কাণ্ড কার-খানা করতে লাগলো যে, অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লো ঐসব ভদ্রলোকেরা। তাদের বশীভূত করে পরবর্তীকালে পুলিশের কাজে আসতে পারে এমন সব তথ্য নথিভুক্ত করে রাখতো সে। ফ্রান্স, রুশিয়া, ইতালির নামকরা ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে এই ধরণের কতকগুলি তথ্য লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে মাতাহারি জার্মানীর ইনটেলিজেন্স বিভাগকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই সংগ্রহ-কেতাবটী বহু বছর ধরে জার্মান পুলিশের দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত ছিল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল:তা কোনোদিনই সিদ্ধ হয়নি।

১৯১০ সালে মাতাহারিকে গোয়েন্দা-বিভায় সুশিক্ষিত করার জন্য ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত .লোরাচে প্রেরণ করা হয়। এখানে ঝানু গুপ্তচররা নবাগতদের শিক্ষা দিয়ে কাজের উপযুক্ত করে তুলতো। এখান থেকে ফিরে এসে মাতাহারি নিজেকে তার নূতন পেশার উপযোগী করে গড়ে তোলে। প্যারীর কৃষ্টি, যা সে আহরিত করেছিল, সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে রাতারাতি যেন সে জার্মান নাগরিকা হয়ে উঠলো।

ইংল্যাণ্ডে জার্মানীর গুপ্তচররা বিশেষ কোনো সুবিধা করতে পারে নি। জার্মান গুপ্তচরবিভাগে এজন্য বেশ উৎকণ্ঠা ছিল। ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত জার্মান গুপ্তচরদের মধ্যে একটা অবসাদ এসেছে বোঝা যাচ্ছিল। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিই ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মানীতে এসে পৌছচ্ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ব্রিটিশদের সৈন্য-সমাবেশ ও ফ্রান্স-যাত্রা সম্বন্ধে কোনো খবরই জানতে পারে নি জার্মানরা। ওরা অনুমান করেছিল যে বেলজিয়ম আক্রান্ত হলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বোধ হয় ইংলিশ প্রণালীর উত্তর দিকের কোনো বন্দরে অবতরণ করবে—এক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণবাহুকে খুব তাড়াতাড়ি বিস্তৃত করে দেওয়া হলে ওরা বিপদে পড়বে। সম্ভাব্য অবতরণ-স্থানগুলি সতর্কতার সংগে পর্যবেক্ষণ করা সত্ত্বেও জার্মান সৈন্যরা শত্রুর সন্ধান পেলনা। একদিন ফন ক্লুকের অশ্বারোহী বাহিনী নিশ্চিন্তমনে কিছুটা অগ্রসর হতেই নিতান্ত অকস্মাৎ প্রবল বাধার সম্মুখীন হলো—ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যে নিঃশব্দে অবতরণ করেছিল ইউরোপের মাটিতে, অথচ জার্মান গুপ্তচরদের ব্যর্থতার জন্য কোনো সংবাদই পূর্বে জানা যায় নি।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড গোড়া থেকেই মাতাহারির ওপর নজর রেখেছিল। তার প্রতিটি গতিবিধি দিনের পর দিন লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল। ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পূর্বে জার্মান সম্রাট বাকিংহাম প্রাসাদে এসেছিলেন। সেই সময় তাঁর কর্মচারীদের একজন প্রাসাদ থেকে এসে লণ্ডনের নিকটবর্তী এক গ্রামে একটী লোকের সংগে দেখা করতে যান। স্বভাবতই এই ব্যাপারে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সন্দেহ জাগে। জানা যায় গ্রামবাসী লোকটি পেশায় নাপিত, নাম গুস্তাভ আর্নস্ট—ইংল্যাণ্ডে জন্ম আর ব্রিটিশ নাগরিক যদিও জার্মান পিতামাতার সন্তান। কিছুদিন যাবৎ

এই লোকটার ওপর নজর রাখার পর পুলিশ আবিষ্কার করেছিল লোকটা হচ্ছে জার্মান পররাষ্ট্র অফিসের ডাক-বাক্স অর্থাৎ সে বার্লিন থেকে বিলিতি ডাকটিকিট মারা চিঠিপত্রের বাণ্ডিল পায়, সেগুলি সে শহরের বিভিন্ন ডাকঘর মারফৎ জার্মান গুপ্তচরদের কাছে বিলি করে। এই কাজের জন্য মাসিক এক পাউণ্ড হারে তার বেতন নির্দিষ্ট ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরই লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার ফলে যুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডে জার্মানীর সমস্ত গুপ্তচরদের কাজ একেবারে ভেঙে পড়ে।

ফ্রান্সে ছিল ইংল্যাণ্ডের বিপরীত অবস্থা। সমর বিভাগের দ্বিতীয় ব্যুরো সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করে পুলিশের হাতে দিয়েছিল গ্রেপ্তারের জন্য। কিন্তু ক্যাইলাকস, হামবার্ট, মালভি প্রভৃতি নেতা ও মন্ত্রীরা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবেই জার্মানদরদী ছিলেন—এদের প্রভাবে পুলিশের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর প্যারীকেই কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছিল মাতা-হারি। কিন্তু যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া নিরপেক্ষ দেশের লোকের পক্ষেও সহজ ছিল না। সীমান্তে এবং প্রতিটি প্রবেশপথেই পুলিশ পরীক্ষা করে দেখতো ভ্রমণকারীর উদ্দেশ্য সন্তোষজনক কিনা। পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য জার্মান সিক্রেট সার্ভিস ভুয়া কাগজপত্রের সাহায্যে গুপ্তচরদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিত। মাতাহারির ক্ষেত্রে সেরূপ কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। দেশে দেশে তার বহু গণ্যমান্য বন্ধুরা রয়েছে, তাদের সাহায্যে সব রকম বিপত্তি থেকেই উদ্ধার পাওয়ার ভরসা ছিল। তাছাড়া একটা চমৎকার কৈফিয়ৎ তৈরী ছিল তার। হল্যাণ্ডে ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে

সে জানিয়েছিল তার স্যুইলি-স্থ সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্যই তার ফ্রান্সে যাওয়া প্রয়োজন।

জার্মান সিক্রেট সার্ভিস থেকে মাতাহারিকে তার খরচার জন্য ত্রিশ হাজার মার্ক দেওয়া হয়েছিল। টাকার লেনদেনের এই ব্যাপারটা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরেছিল—তাই মাতাহারির লক্ষ্যস্থল প্যারী জানামাত্রই ওরা ঐ খবরটা প্যারীর সেকেণ্ড ব্যুরোকে পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু মাতাহারির বিরুদ্ধে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে তার বিরুদ্ধে কিছুই করা যাচ্ছিল না। প্যারীতে সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার পর মাতাহারির হল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন না করার পক্ষে যখন আর কোনো যুক্তি রইলো না, তখন সে জানালো, সে রেডক্রশে আত্মনিয়োগ করেছে আর Chemin des Dames অঞ্চলের ভিত্তেল শহরের হাসপাতালের ডিউটিতে তাকে বহাল করা হয়েছে।

১৯১৫ সালের মে ও জুন মাসে আর্তয়ে আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হলে স্থির হয় যে মিত্রশক্তি শ্যাম্পেন ও আর্তয়ে যুগপৎ ব্যাপক আক্রমণ চালাবে। কোথায় আক্রমণ হবে শত্রুপক্ষ যাতে পূর্বে বিন্দুমাত্রও না আঁচ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মের সময় ভসজেস ও আর্গনে ফরাসীদের স্থানান্তরিত করা হয়। ফরাসীদের রক্ষা-ব্যবস্থা এই সময়ে এমন সুসম্পূর্ণ বলে মনে হয় যে রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত অঞ্চলগুলি থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নূতন নূতন ডিভিসন তৈরী হতে থাকে, আর সৈন্যদের জোর মহড়াদেওয়া হয়। পূর্ব রণাংগনের ওপর থেকে চাপ কমানো আর জার্মান সৈন্যবাহিনীকে বামদিক থেকে পর্যুদস্ত করে উত্তরে রাইন নদী

পর্যন্ত ছটিয়ে দেওয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে সকলেই আশান্বিত হয়ে উঠে। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আক্রমণ করা সাব্যস্ত হয়।

ভিত্তেলের কাছাকাছি একটা স্থান অন্যতম আক্রমণস্থল বলে স্থিরীকৃত হয়। স্বভাবতই ছোট্ট শহরটি হাসপাতাল ও ছোট ছোট ইউনিট ও এয়ারস্কোয়াড্রনে জমজমাট হয়ে উঠলো। মাতাহারি ভিত্তেলে এসে হাজির হলো ফরাসী মন্ত্রীপরিষদের কয়েকজন ব্যক্তির সাহায্যে। প্যারীতে তার একটি রুশ বন্ধু জানিয়েছিল যে একটি সেনানী যুদ্ধে আহত হয়ে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে, তার শুশ্রূষার প্রয়োজন। এই সৈন্যটি হচ্ছে পশ্চিম রণাংগনের রুশ বাহিনীর ক্যাপ্টেন মারভ। সেই সময়ে সে ভিত্তেলের হাসপাতালে ছিল। মাতাহারি ঠিক করলো তার সেবা করবে।

সেকেণ্ড ব্যুরো মাতাহারিকে আটক করার প্রয়াস পেয়েছিল। মাতাহারির দরদী বন্ধু ফরাসী মন্ত্রী মঁসিয়ে মালভি ও পররাষ্ট্র অফিসের প্রধান ব্যক্তিকে তারা বলেছিল, সৈন্যাঞ্চলে যখন আমাদের দেশের লোকদেরই যেতে দেওয়া হয় না, তখন মাতাহারির মত একজন ভ্রষ্টা নর্তকীকে কেন ওখানে যাবার অনুমতি দেওয়া হবে? প্রত্যুত্তরে মন্ত্রীদ্বয় বলেছিলেন, আমাদের নাগরিকদের তাদের নিজস্ব স্বার্থেই ওখানে প্রবেশ করতে দেওয়া না, কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন নিরপেক্ষ দেশের ব্যক্তিদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের অসুবিধায় ফেলতে আমরা চাই না। বিশেষ করে ডাচ-যুবতী শিল্পী মাতাহারি যখন আমাদের একজন আহত বীরকে সেবা করবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, তখন তাকে আমরা বাধা দিতে পারি না।

সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে এবারেও সেকেণ্ড ব্যুরো মাতাহারির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারলো না।

ক্যাপ্টেন মারভকে বোধ হয় ভালোবেসেছিল মাতাহারি। রহস্যময়ী মাতাহারির চরিত্রের এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য মারভ। এ পর্যন্ত বহুর প্রেমে তৃপ্ত ছিল তার জীবন কিন্তু ক্যাপ্টেন মারভের আবির্ভাব তার জীবনকাহিনীতে ছোট হলেও সম্পূর্ণ এক নূতন অধ্যায়। এই অসহায় সৈনিকটি মাতাহারির কাছে একান্তভাবে জীবন সমর্পন করেছিল, আর যে ভালোবাসা অন্ধ, দেহ-বুভুক্ষা যেখানে গৌণ, বোমার আঘাতে দৃষ্টিলুপ্ত ক্যাপ্টেন মারভের সেই ভালোবাসায় মাতাহারি আস্বাদ পেয়েছিল নূতন জীবনের। তাই মারভের কাছে যে মুহূর্তগুলি তার ব্যয়িত হতো, অনন্ত কালপ্রবাহের সেই একেকটি বুদ্বুদ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত তাকে রূপান্তরিত করতো কলংকচিহ্নহীন নারীত্বের মর্যাদায়।

ক্যাপ্টেন মারভের মত দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বচ্ছন্দে রাখার জন্য মাতা-হারির কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট অর্থের। শুধু মারভের জন্যও নয়, তার অত্যুগ্র বিলাসী মনের পক্ষেও। মারভের শয্যাপার্শ্বে সর্বক্ষণ সে থাকতে পারতো না, বোমা-বিধ্বস্ত ছোট ভিত্তেল শহরের এমন কিছু ঐশ্বর্য ছিল না যা তার রুচিকে তৃপ্ত করতে পারতো। ফ্রন্ট-লাইনের ঠিক পেছনে অগুনতি লোকের ভিড় এই ছোট্ট গ্রামগুলিতে তখন চূড়ান্ত অস্বাচ্ছন্দ্য আর আবদ্ধ জীবন। যুদ্ধের দাবী মেটাতে সামাজিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। মাতাহারি এই অবস্থায় সৈন্যদের কাছে দেহ বিক্রি করতে সুরু করলো। এইভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হতো, তাতে তার বিলাসের ব্যয় ও ক্যাপ্টেন মারভের হাসপাতালের খরচ নির্বাহ হতে লাগলো।

মাতাহারি পরে বলেছিল, ভিত্তেলে দৃষ্টিহীন ঐ কৃশ যুবকটিকে পেয়ে আমি ঘৃণ্য জীবনবৃত্তি পরিত্যাগ করার সংকল্প করেছিলাম। জীবনে সত্যিকার ভালবেসেছি এই ছেলেটিকেই একমাত্র।

ক্যাপ্টেন মারভের প্রতি তার সুস্পষ্ট প্রেম সম্পর্কে সন্দেহ করা না গেলেও এটুকু বলা যায় মাতাহারি তার আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয় নি। মিত্রশক্তির সম্ভাব্য আক্রমণের বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। ক্যাপ্টেন মারভকে নিতান্ত দৈবক্রমে পাওয়ায় সে ভিত্তেলে অবস্থানের চমৎকার কারণ দেখাতে পেরেছিল।

এই সময় সৈন্যদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা খুব বেড়ে যায়। মাতাহারি বিমানবাহিনীর সৈনিকদের সব চেয়ে বেশী পছন্দ করতে থাকে। বহু যুবক বৈমানিক তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছুটি কাটাতে থাকে। তারা এই প্রেয়সী নারীর নিঃসংগ অবকাশ বৈচিত্র্যে মধুর করার আশায় বিমানবহরের নানা গল্প বলতো, মাতাহারিও কৃত্রিম সারল্যের সংগে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করে নিতো। হতভাগ্যরা জানতেও পারতো না ছলনাময়ী তাদের ওষ্ঠে সুরাগন্ধী চুম্বনের সাথে মৃত্যুর স্বাক্ষর এঁকে দিত।

ক্যাপ্টেন মারভকে সম্মুখে রেখে মাতাহারি এইভাবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে, এসব তথ্য প্রকাশিত হবার পর, অনেকে এজন্য মারভকে মাতাহারির অপরাধ-সহচররূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ প্রসংগে একথা সুস্পষ্টরূপে বলা যায়, ক্যাপ্টেন মারভ মাতাহারির চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। শুধু আশ্চর্য এই যে মিত্রপক্ষের সৈনিক মারভ ও জার্মানীর গুপ্তচর মাতাহারির প্রেম নিঃসন্দেহে ছিল অকৃত্রিম।

মাতাহারির উদ্দেশ্য সামরিক মহলে সন্দেহের উদ্রেক না করলেও সেকেণ্ড ব্যুরোকে সে প্রতারিত করতে পারে নি। মাতাহারির সম্বন্ধে সেকেণ্ড ব্যুরোর বিন্দুমাত্রও ভ্রান্তি ছিল না। তাদের নজর ওর ওপর কোনোদিনও শিথিল হয় নি, যদিও তারা এখন আগের

মতই ব্যর্থ হলো মাতাহারির কার্যকলাপের একটু রহস্য-সূত্র আবিষ্কার করতে।

বহু-প্রতীক্ষিত আক্রমণের দিন অগ্রসর হয়ে আসছিল। জুন ও জুলাই মাস কেটে গেল আয়োজনের উত্তেজনায়। কিন্তু কোন্ ফাঁকে আক্রমণের তারিখ ও আক্রমণ স্থলের নির্দেশ পৌঁছে গেল শত্রুপক্ষের হাতে জানতেও পারলো না মিত্রশক্তির গুপ্তচর প্রতিরোধ বিভাগ। তাদের ধারণা ছিল শত্রুপক্ষ এ বিষয়ে কিছুমাত্র জানতে পারে নি।

সেপ্টেম্বর ২৫ তারিখে দুপুরের সামান্য পরে পদাতিকদের আক্রমণ শুরু হলো আর্তয়ে। আক্রমণের আকস্মিকতায় শত্রুপক্ষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। জার্মান ব্যারাজ (গোলন্দাজ বাহিনীর সমাবেশ) নামলো অনেক দেরীতে, বিশৃঙ্খলায় তারা তাদের পদাতিকদের রক্ষা করতে পারলো না। ভিমি রিজ রক্ষার জন্য জার্মান রিজার্ভ বাহিনীও আসতে পারলো না। তিন দিন ধরে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল দুর্মর ফরাসী বাহিনী।

কিন্তু আরো দক্ষিণমুখী আক্রমণে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো ফরাসীদের। আক্রমণের পরিকল্পনার সময় জানা গিয়েছিল সেখানে জার্মানদের ৯০ ব্যাটালিয়ন প্রতিরক্ষা-সৈন্য ছিল। আক্রমণ শুরু হলে দেখা গেল শত্রুশক্তি এখানে ১৯২ ব্যাটালিয়নে বাড়ানো হয়েছে। প্রচণ্ড গোলা বর্ষণে সামান্য অগ্রগতি সম্ভব হলেও ফলাফল সম্বন্ধে যে উচ্চাশা পোষণ করা হয়েছিল, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। হিসাব করে দেখা গেল ফরাসীদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ৮০,০০০ আর আহত ১০০,০০০।

আগষ্টের মাঝামাঝি আক্রমণের তারিখ ও স্থল জার্মানদের কাছে পৌঁছেছিল। ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রতারিত হয়েছিল জার্মানীর গুপ্তচরদের দ্বারা, আর ফরাসী গুপ্তচর প্রতিরোধ বিভাগ এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছিল।

মিত্রশক্তির লক্ষ লক্ষ হতাহতের জীবনের জন্য দায়ী ছিল প্রধানত একজন গুপ্তচর, যার বিরুদ্ধে তখনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায় সেকেণ্ড ব্যুরো আক্রোশে ছটফট করছিল।

Chemin des Dames ওপর আক্রমণের কয়েকদিন আগে মাতাহারি ভিত্তেল ছেড়ে প্যারীতে এসে তার পূর্বেকার জীবন শুরু করে দিয়েছিল। প্যারীতে আসার কয়েকদিন পরেই সে হল্যাণ্ডের দূতাবাসে তার মেয়ে জেন লুইয়ের কাছে পাঠাবার জন্য একটী চিঠি দেয়। রাজদূত চিঠিটার মধ্যে বিচক্ষণ জননীর উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে না পেয়ে হল্যাণ্ডে পাঠাতে সম্মত হন। কিন্তু দূতাবাসে উপস্থিত একজন ফরাসী গোয়েন্দা সন্দেহক্রমে চিঠিটা পরীক্ষার জন্য নকল করে নিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে সেটী কন্যার প্রতি জননীর উপদেশ বলে প্রতীয়মান হলেও কিছুকাল পরে যখন বিশারদরা এর যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটিত করলেন, তখন দেখা গেল ফরাসীদের গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মূল্যবান গোপন তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে চিঠিটীতে।

সাধারণ ভাষায় লেখা এই ধরণের স্বাভাবিক পত্রের মাধ্যমে মাতাহারি তার সংগৃহীত তথ্যাদি পাঠাচ্ছে—সেকেণ্ড ব্যুরো এতদিনে তার বিরুদ্ধে ধরবার মত সূত্র দেখতে পেল। আরো কয়েকদিন পরে, Chemin des Dames ওপর আক্রমণ সংঘটিত হবার পর, ডাচ দূতাবাসে মাতাহারির নামে একখানি চিঠি এলো, যা সেকেণ্ড ব্যুরোর অনুমানকে অভ্রান্ত প্রমাণিত করলো।

অনভিজ্ঞা যুবতী কন্যার জবাব নয় এটী, দেখা গেল চিঠির মধ্যে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।মাতাহারিকে Chemin des Dames এর ওপর আক্রমণ সম্বন্ধে তার প্রেরিত সংবাদ নির্ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্য আর সেজন্য তাকে তার প্রাপ্য পুরস্কার দেওয়ার কথাও লেখা ছিল ওতে।

আশি হাজার নিহত, এক লক্ষ আহত ও বিশ হাজার নিখোঁজ সৈন্যের কজন তার মরণাত্মক চুম্বনের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করেছিল জানি না, কিন্তু হতভাগ্যদের অভিশাপের নিঃশ্বাসে মাতাহারির আয়ু ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল। শত্রুর গুপ্তচর হিসাবে ওকে অভিযুক্ত করার পক্ষে কোনো বাধাই ছিল না, কিন্তু এবারও মাতাহারি সেকেণ্ড ব্যুরোকে পরাজিত করতে সমর্থ হলো ফ্রান্সের জাতীয় নীতির দুর্বলতার সুযোগে।

যুদ্ধের এই সময়টাতে ফ্রান্সে তখন দলাদলি প্রবল হয়ে উঠেছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে মন্ত্রীসভায় সংকট আসন্ন। সেনাদলের কোনো এক অংশে বিদ্রোহও দেখা দিয়েছে। যুদ্ধক্লান্ত জনসাধারণের মধ্যে জেগে উঠেছে হতাশা আর যুদ্ধবিরোধী আদর্শবাদীদের প্রচারকার্যে ফরাসী দেশের শহরে শহরে বিপ্লবের অস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যে সব নিরপেক্ষ দেশের মিত্রশক্তিবৃন্দের প্রতি সহানুভূতি ছিল না, ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে তারা বিপক্ষদলে যোগদানের উদ্যোগ করছে। ফরাসী নেতাদের কাছে শেষের ব্যাপারটী চরম আশংকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁরা জানতেন এই সব দেশগুলি তাঁদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করলে যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই অবিলম্বে তাঁরা এমন এক নীতি গ্রহণ করলেন, যাতে নিরপেক্ষ দেশগুলির সংগে তাঁদের বাইরের বন্ধুত্ব বজায় থাকে। এই নীতির ফলেই মাতাহারির বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তার গতিবিধির ওপর কোনোরূপ বাধানিষেধ আরোপিত হলো না। সেকেণ্ড ব্যুরোর শুধুমাত্র এই সান্ত্বনা রইলো যে তার চিঠিপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাবে কি কি সামরিক গোপন তথ্য সে লুণ্ঠন করতে পারে।

ভিত্তেল ছেড়ে প্যারীতে এসে মাতাহারি আবার তার পূর্বেকার নর্তকী জীবন আরম্ভ করলো। প্যারীর অভিজাত সম্প্রদায় ও

ফরাসী মন্ত্রীপরিষদের ব্যক্তিরা আগেকার মত আবার তার আড্ডায় এসে হাজির হতে থাকে। প্যারীতে থাকা এবার আর বেশীদিন স্থায়ী হলো না। হঠাৎ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেল মাতাহারি স্পেনে নৃত্য-প্রদর্শনের জন্য যাত্রা করছে। স্পেনে তার সংগে জার্মান দূতাবাসের নৌ ও সমরবিভাগীয় এ্যাটাচি এবং স্পেনীয় জার্মান ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের কর্তা লেফ্‌টেন্যাণ্ট ফন ক্যালে ও ফন ক্রুনের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়।

১৯১৫ সালের সারা গ্রীষ্মকাল ধরে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের গুপ্তচররা প্যারী ও লণ্ডনে খবর পাঠাতে থাকে যে ঐ দুজন লোকের সান্নিধ্যে মাতাহারির অধিকাংশ সময় কাটছে। একবার নাকী সে ব্যস্ততার সংগে বার্সিলোনায় জার্মান গুপ্তচর বিভাগের অফিসেও যায়। আরো খবর আসে সে আগামী বৎসরে হল্যাণ্ড যাবার মনস্থ করেছে। পরবর্তী বছরের গোড়ায় মাতাহারি হল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। ফালমাউথের কাছে ব্রিটিশ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাকে জলযান থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তদানিন্তন কর্তা স্যর বেসিল টমসন অসংখ্য প্রশ্ন করেও তাকে অভিযুক্ত করার মত কোনো স্বীকারোক্তিই বার করতে পারেন নি। ফন ক্যালে ও ক্রুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে মাতাহারি বলেছিল ওরা যে গোপন বিভাগের লোক তা সে জানে না, সে ওদের শুধু জার্মান কূটনৈতিক দপ্তরের লোক বলেই জেনেছে। টমসন কিছুতেই মাতাহারিকে পরাস্ত করতে না পেরে এই বলে ছেড়ে দিলেন যে যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিন যেন সে হল্যাণ্ড ছেড়ে কোথাও না যায়। জার্মানী ও ফ্রান্সে যাওয়ার বিরুদ্ধে তাকে সতর্ক করে দিলেন।

টমসন তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন, প্রশ্নোত্তরের সময় মাতাহারির দ্রুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সচেতন আত্মবিশ্বাস তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

তার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে নি। সেসময়ে তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, তার প্রশ্রুত-খ্যাতি রূপ-লাবণ্য তখন ম্লান হয়ে আসছে।

মাতাহারি বুঝতে পারে নি যে হল্যাণ্ড ও জার্মানীতে ব্রিটিশ এজেণ্টরা ইতিপূর্বেই তার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ পেয়েছে। তাই সে আমষ্টারডামে পৌঁছেই সেখানকার এক তামাকের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলো। ম্যাকস ম্যুডের নামক একটা লোক সেই দোকানের মালিক—দোকানটা যে বিভিন্ন জার্মান গুপ্তচরের 'ডাকবাক্স', তা ব্রিটিশ গুপ্তচরদের অজানা ছিল না। লণ্ডন ও প্যারীতে অনতিবিলম্বে মাতাহারির এই দোকানে আসার সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হলো।

এই সময় জার্মান কর্তৃপক্ষ একজন ব্রিটিশ গোয়েন্দার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। গোয়েন্দাটার নাম 'মিঃ সি'—আসল নাম সিডনি রিলি। জার্মান নৌ-দপ্তর থেকে একটা মূল্যবান পরিকল্পনা চুরি করে নিয়ে আসা এরই কীর্তি।

জার্মান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে একদিন হুকুম আসে সম্রাটের কাছ থেকে নৌ-পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দেশ আনার জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মচারীকে পাঠাতে। একজন অখ্যাত জুনিয়র অফিসারকে পাঠানো হয়। নূতন ডুবো-জাহাজ সংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যার সময় এই লোকটার বিচক্ষণতা এবং সামরিক ও নৌ-সংক্রান্ত ব্যাপারে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া আলোচনা-কালে সে বহু জটিল ব্যাপারও ভালো করে বুঝে নেয়। তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সম্রাট এত খুশি হন যে তাকে ভোজের আসরে নিমন্ত্রণ করেন।

সিডনি রিলি কিভাবে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের চোখ এড়িয়ে নৌদপ্তরে প্রবেশ করেছিলেন এবং সম্রাটের পরিকল্পনা লণ্ডনে প্রেরণ করেছিলেন, সেটা আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে।

মাতাহারি যখন হল্যাণ্ডে, তখন জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে ব্রিটিশ গুপ্তচর রিলির দলিলচুরির ব্যাপার অগোচর নেই। তার কাছে মূল্যবান দলিলপত্র আছে এই ধারণা জার্মান কর্তৃপক্ষের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অনেক আগে বলকান রাজ্যগুলির কোনো একটি শহরে রিলির সংগে মাতাহারির সাক্ষাৎ ঘটেছিল একবার। তাই মাতা-হারিকে ওরা ডেকে পাঠালো এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য। রিলি এককালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন তাই মাতাহারি স্বপ্রচারিত ভারতীয় পরিচয়টুকুকে কাজে লাগাতে চাইলো রিলির সংগে সাক্ষাৎকারের বেলায়।

সিডনি রিলিকে খুঁজে বার করে মাতাহারি আলাপ জমাবার অছিলায় বল্লে: মনে হচ্ছে আগে কোথাও যেন আমাদের দেখা হয়েছিল, বোধ হচ্ছে ভারতবর্ষে।

রুক্ষ গলায় সিডনি রিলি জবাব দিলেন, দেখা হয়ে থাকে তো বার্লিনেই। রিলি ওকে কথা বলার সুযোগ দিলেন না।

জার্মান-অধিকৃত বেলজিয়মে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের নিযুক্ত গোয়েন্দা-দের কার্যকলাপে জার্মান কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এই গুপ্তচরদের কার্যকলাপ প্রত্যহই বেড়ে চলেছিল। এদের আবিষ্কার করার কাজে মাতাহারিকে নিযুক্ত করলো জার্মানরা। সুইজারলাণ্ডের ভিতর দিয়ে প্যারীতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তাকে।

প্যারীতে আসার পর একদিন সকালে মাতাহারি সেকেণ্ড ব্যুরোর দপ্তরখানায় সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। তখুনি ওকে উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। মাতাহারির জন্য গোটা সেকেণ্ড ব্যুরো সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। তারা জানতো স্যর বেসিল টমসনের সতর্ক বাণী উপেক্ষা করেই সে বার্লিনে গিয়েছিল ও ফের এসেছে প্যারীতে।

কোনোরূপ ভূমিকা না করেই সে ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসে কাজ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বল্ল যে এ কাজে সে বিশেষ উপযুক্ত বলেই বিবেচিত হতে পারে, কারণ বার্লিন ও অন্যান্য শহরে তার অনেক নামজাদা প্রভাবশীল বন্ধু আছে।

সেকেণ্ড ব্যুরোর ক্যাপটেন লেদু জিজ্ঞাসা করলেন, ডাচ নাগরিক হয়ে এ কাজ আপনি কেন নিতে যাবেন, যেখানে পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু ? ফ্রান্স আপনার স্বদেশ নয়। স্বদেশ-প্রীতির জন্য তো এ কাজে উদ্বুদ্ধ হন নি আপনি ?

মঁসিয়ে ক্যাপ্‌টেন, মাতাহারি জবাব দিল, ভয়ানক অর্থাভাব চলেছে আমার। তাই এই কাজই আমি নিতে চাই। বিশ্বাসঘাতকতার ভয় করবেন না আপনারা, কারণ জার্মানীও আমার স্বদেশ নয়। আমার সহানুভূতি ফরাসীদের ওপরই !

অফিসারকে সন্দিগ্ধ দেখে মাতাহারি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, হয় তো আমাকে আপনারা বিশ্বাস করতে পারছেন না, কিন্তু বিশ্বাস করলে লাভবানই হবেন। মূররা কি উপায়ে অস্ত্র-সংগ্রহ করেছে জানেন কি ?

জানি আমরা।

আপনারা জানেন সাবমেরিনে সরবরাহ আসে। কিন্তু কোথায় এবং কখন আসে জানেন কি ? এমন একটা খবর আমার জানা আছে যেটা আপনাদের পক্ষে খুবই মূল্যবান হতে পারে।

ফ্রেঞ্চ প্রটেক্‌টরেট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল আলজিরিয়া ও মরোক্কোর দেশীয় অধিবাসীরা ১৯১২ সাল থেকে। জার্মানদের উস্কানি এ ব্যাপারে ছিলই। প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকলে ফরাসী সৈন্যদের কিছু অংশ ওখানে আটকে থাকতে বাধ

হবে এই উদ্দেশ্যে জার্মানরা গোপনে ওদের মধ্যে আধুনিক ধরণের রাইফেল বিলি করতে থাকে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ চাইছিল অস্ত্র সরবরাহের গোপন উৎসটা জানতে, যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন করে যত বেশী সম্ভব সংখ্যক সৈন্য ওখান থেকে সরিয়ে এনে ফরাসী রণক্ষেত্রে নিয়ে আসা যেতে পারে। মাতাহারির কাছ থেকে এ বিষয়ে আলোকপাতের সম্ভাবনা দেখে ফরাসী সেকেণ্ড ব্যুরো অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে উঠলো।

—মঁসিয়ে, মার্চ মাসের গোড়ার দিকে মেহেদিয়া পোতাশ্রয়ের ওপর নজর রাখলেই আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হবে। ভূমধ্যসাগরের প্রবেশমুখে বিশ্রাম নেবার আগেই ডুবোজাহাজগুলো ঐ পোতাশ্রয়ে রাইফেলের পার্শেলগুলো নামিয়ে দিয়ে যায়।

ধন্যবাদ দিয়ে ক্যাপ্টেন লেদু জানালেন, কথাগুলো যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে মাতাহারিকে গুপ্তচর বিভাগের কাজে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তার আগে, তিনি জানতে চাইলেন এই গোপনীয় ব্যাপারটা কি করে জানলো সে।

মাতাহারি জানালো যে কূটনীতিকদের গৃহে অতিথিদের আনন্দ দান করতে হামেশাই তাকে যাতায়াত করতে হয়। কয়েকজনের সংগে তার ঘনিষ্ঠতা খুবই বেশী এবং তাঁরা কিছুটা প্রগল্ভ হওয়ার দরুনই ঐ মূল্যবান সংবাদটা তার গোচরে এসেছে।

অল্পদিন পরেই মাতাহারি সেকেণ্ড ব্যুরোর দপ্তরে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে বলা হলো তার বিবৃতি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সে কি ধরণের কাজ চায় জিজ্ঞাসা করা হলো।

মাতাহারি বল্ল, সম্প্রতি বেলজিয়মে নাচের একটা চুক্তিতে আমি সই করেছি। ডাচ নাগরিকা হওয়ার দরুন আমার তো কোথাও যেতে বাধা নেই। তাই হল্যাণ্ড থেকে ব্রুসেল্‌সে যাওয়াই আমার পক্ষে

সুবিধাজনক। আমার এক কূটনীতিজ্ঞ বন্ধু বলেছিলেন যে শত্রু অধিকৃত দেশগুলির গুপ্তচরদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া নাকী খুবই দুরূহ ব্যাপার। আমি তাই প্রস্তাব করেছি বেলজিয়মে আপনাদের যে সব গুপ্তচর আছে তাদের কাছে আপনাদের নির্দেশ বহন করার কাজে আমাকে নিযুক্ত করা হোক।

সেকেণ্ড ব্যুরো থেকে বলা হলো, যাত্রার পূর্বে তাকে বেলজিয়ামস্থিত মিত্রপক্ষীয় গুপ্তচরদের একটী তালিকা ও সেকেণ্ড ব্যুরোর নির্দেশ তাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তার হাতে দেওয়া হবে।

মাতাহারিকে কখনোই মিত্রপক্ষের গোয়েন্দাবিভাগ বিশ্বাস করে নি। তাই তার হাতে স্বপক্ষীয় গুপ্তচর বলে বর্ণিত এমন বারোজন লোকের নাম ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল, যাদের একজন ছাড়া আর সব ব্যক্তিই ছিল কাল্পনিক। সত্যিকার যে গুপ্তচরটীর নাম দেওয়া হয়েছিল, সে মোটেই বিশ্বাসভাজন ছিল না, কিছুদিন যাবৎ লোকটী একবার জার্মান আরেকবার ফরাসীদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করে বেড়াচ্ছিল নিজের সুবিধামত।

ফরাসী কর্তৃপক্ষ মাতাহারির যাত্রার ব্যবস্থা করে দিল। প্রথমে ইংল্যাণ্ড তারপরে হল্যাণ্ডগামী জাহাজে চড়ে সে তার অভীপ্সিত স্থানে যেতে পারবে। ইংল্যাণ্ডে মাতাহারির গমন সম্বন্ধে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই সেখানে তাকে কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হলো না, যদিও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাকে পূর্বের মতই সন্দেহের চোখে দেখছিল। বার্থ পেতে বিলম্ব হওয়ায় মাতাহারি লণ্ডনে রইলো কয়েকটা দিন। সেই সময়টা ডোভার বন্দরের যুদ্ধ সামগ্রীর পরিমাণ সম্বন্ধে একটা আঁচ করে নিলো সে, লণ্ডন নগরীতে বিমানাক্রমণের সম্ভাব্য ফল ও প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও দেখে নিলো। তারপর একদিন হৃদয়ে

অনন্ত আশা নিয়ে সাফল্যের সম্ভাবনায় উন্মুখ হয়ে মাতাহারি হল্যাণ্ডের জাহাজে উঠে বসলো। মনে তখন তার এক বিচিত্র আত্মতৃপ্তি। স্যর বেসিলের মত লোকের চোখে ধূলি দেওয়া ও সেকেণ্ড ব্যুরোকে প্রতারিত করতে পারা—মাতাহারির কাছে মস্ত সাফল্য বলে মনে হতে লাগলো। এরপর যখন সে প্যারীতে ফিরবে, তখন এভাবে নয়। হল্যাণ্ড বেলজিয়মে তার অসংখ্য ভক্ত রয়েছে—আর রয়েছে তার প্রিয়তম জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের অফিসার প্রণয়ীরা। ভবিষ্যতে কোনোদিন যদি প্যারীতে ফিরতে হয় তবে সে ফিরবে বিজয়ী জার্মান সেনাপতির অংকশায়িনী রূপে।

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রদূতাবাসগুলির মধ্যস্থতায় মাতাহারির যে সব চিঠিপত্র আসতো, তার একটীতে অনুরোধ করা ছিল আরো দ্রুত কাজ হাসিল করতে। ফরাসীরা অনুমান করতে পেরেছিল যে সেকেণ্ড ব্যুরোর অধীনে ওর নিযুক্ত হবার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমান থেকে মিত্রপক্ষীয় গুপ্তচরদের শত্রু অধিকৃত দেশে অবতরণের সঠিক স্থানটী জেনে নেওয়া। ফরাসী কর্তৃপক্ষ তার হাতে যে বারোজন গুপ্তচরের নাম দিয়েছিল, মাতাহারি সেটা প্রথমে জার্মানদের কাছে পাঠিয়ে দিল। সেইজন্যই দেখা গিয়েছিল তালিকাটী মাতাহারির হস্তগত হবার পরই জার্মানরা ব্রুসেলসে সেই বিশ্বাসঘাতক চরকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তিন সপ্তাহ পরে তাকে গুলি করে মেরেছে। জার্মান কর্তৃপক্ষের হাতে ঐ লোকটীর গ্রেপ্তার ও মৃত্যুতে সেকেণ্ড ব্যুরো মাতাহারির বিরুদ্ধে আরেকবার সন্দেহ করার সুযোগ পেল। কারণ এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল সেকেণ্ড ব্যুরো কর্তৃক রচিত তালিকা জার্মানরা নিশ্চয়ই দেখেছে এবং বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরটীর নাম ঐ তালিকাভুক্ত দেখে সিদ্ধান্ত করেছে লোকটী শুধুমাত্র

ফরাসীদের চর। মাতাহারির বিরুদ্ধে শত্রুর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির আরেকটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সেটা হচ্ছে যে সময়ে সে শোচনীয় অর্থা-ভাবের কারণ দেখিয়ে সেকেণ্ড ব্যুরোর অধীনে নিযুক্ত হবার প্রার্থনা জানিয়েছিল, তখন অনুসন্ধানে ব্যাংকে তার নামে একটা বৃহৎ অংকের জমা দেখা গিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার আরো একটা কারণ হচ্ছে জার্মান ডুবোজাহাজ কর্তৃক আলজিরিয়ায় ও মরক্কোয় অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারটা তার পক্ষে জানা। ঐ ধরণের সংবাদ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে জানা একান্ত অসম্ভব। তাই তার হল্যাণ্ডে যাবার ইচ্ছা দেখে সেকেণ্ড ব্যুরোর ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই সে ফরাসী সরকারী মহলের প্রণয়ী বন্ধুদের কাছ থেকে অতি মূল্যবান কোনো তথ্য হস্তগত করেছে এবং সেটা তার হল্যাণ্ডে জামান কর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই-ই।

ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে সেকেণ্ড ব্যুরো মাতাহারিকে আটক করতে উৎসুক হলো। কিন্তু আটকের ফলে মাতাহারি সতর্ক হয়ে উঠতে পারে আর তার বিরুদ্ধে মিত্র-পক্ষের সন্দেহ উপলব্ধি করতে পারবে। তাই তার যাত্রায় কোনোরূপ বাধা না দিয়ে তার হাতে গুপ্তচরদের তালিকাটি দিয়ে মাতাহারি কোন সুড়ংগ পথে জামান কর্তৃপক্ষের হাতে সেটা তুলে দেয় দেখার জন্য সেকেণ্ড ব্যুরো সজাগ হয়ে রইলো।

কিন্তু আশ্চর্য যে সেকেণ্ড ব্যুরোর সতর্ক দৃষ্টি এবারও হার মানলো। বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরটার জার্মান কর্তৃপক্ষের হাতে মৃত্যু হওয়াতে মাতা-হারি সম্বন্ধে সেকেণ্ড ব্যুরোর আর কোনো সংশয়ের অবকাশ রইল না। লণ্ডন পুলিশের পরামর্শ মত আরো কিছুকাল ধরে তার ওপর যথেষ্ট কড়া নজর রাখা হলো কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ বলে মনে হতে লাগলো। অগত্যা ঠিক হলো এই বিপজ্জনক নারীকে আর এভাবে চলাফেরা করতে দেওয়া সংগত হবে না।

তাই হল্যাণ্ড যাবার পথে কয়েকদিন লণ্ডনে অবস্থানের পর সে যখন মধ্যরাত্রে জাহাজে উঠে ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নের দিনগুলির কথা চিন্তা করছিল, আর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন গোয়েন্দাদের প্রতারিত করার গর্ব অনুভব করছিল, তখন সে জানতেও পারে নি যে নিকট ভবিষ্যত তার সমস্ত স্বপ্নকুয়াশার অবসান ঘটিয়ে তাকে অতি নিষ্ঠুর নিয়তির মুখো-মুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। পরদিন সকাল হলে সে যখন ডেকে গিয়ে তার স্বদেশভূমির নীচু তটরেখা দেখতে গেল, তখন বিস্মিত হয়ে সে শুধু দেখলো অপার সমুদ্রের অশান্ত তরংগরাজি। জাহাজের অফিসারকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বল্লে, আগামী দুদিনের মধ্যে আর আমরা মাটিতে পা দিচ্ছি না—

হল্যাণ্ড যেতে আজকাল কি এত সময় লাগে? অনুৎসাহিত কণ্ঠে মাতাহারি বল্ল।

অফিসারটী আকাশ থেকে পড়লো, হল্যাণ্ড! আমরা তো স্পেনে চলেছি; আর দিন দুয়েকের মধ্যে আপনি কাদিজে পৌঁছবেন, অবশ্য ডুবোজাহাজগুলি যদি না আমাদের দেখতে পায়।

মাদ্রিদে মাতাহারির অবস্থান সুখকর হয় নি। প্রথমত তার কাছে তখন কপর্দকও ছিল না। দ্বিতীয়ত তার মনে ক্রমশ একটা ধারণা তখন থেকে গড়ে উঠতে সুরু করেছিল যে ফরাসী বা ইংরেজরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। অগত্যা স্পেনে জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে দেখা করলো সে। জার্মানরা তাকে পুনরায় প্যারী যাওয়ার নির্দেশ দিল। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ট্যাংকের কার্যকারিতা কিরূপ সেটা তখন জার্মানদের পক্ষে জানা একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু মাতাহারি ফ্রান্সে যেতে ইতস্তত করছিল। ফ্রান্সে তাকে কি ভাবে গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে তার মনে প্রতিকূল সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু জার্মান

সিক্রেট সার্ভিসের নির্দেশ একবার নিক্ষিপ্ত হলে আর ফিরে আসে না। মাতাহারির ফ্রান্সে যাওয়ার কোনো অন্যথা হলো না। যাত্রার প্রাক্কালে ফন ক্রুন আমষ্টারডামে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের কাছে বেতারে সাংকেতিক বার্তা মারফৎ অনুরোধ জানালেন মাতাহারির জন্য পনেরো হাজার মার্ক পাঠাতে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই তারবার্তাটী ফরাসীদের বেতার গ্রাহক ষ্টেশনে ধরা পড়ে এবং জার্মানদের সংকেত বার্তার সমাধান সূত্র ফরাসীরা কোনো ক্রমে হস্তগত করায় তারবার্তার মর্ম উদ্ঘাটন করতে তাদের দেরী হয় না।

মাতাহারির আসার সংবাদ পেয়ে ফরাসী পুলিশ ষ্টেশনে সতর্কভাবে পায়চারি করছিল। ওর বন্ধু ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন অফিসার সামান্য কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ওকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল। মাতাহারি তার মাল-পত্র প্লাজা-এথিনি হোটেলে পাঠিয়ে দিয়ে ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে অফিসারটির গাড়ীতে উঠে পড়লো। ফরাসী পুলিশ এবার একটী ভুলের পরিচয় দিল, যেটা ব্রিটিশ পুলিশ কখনো করতো না। পররাষ্ট্র দপ্তরের বন্ধুটীর সংগে ওকে যেতে দেখে পুলিশ তখনকার মত ওর পিছু না নেওয়াই সাব্যস্ত করলো।

এর পর কয়েকদিন ধরে মাতাহারির কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। পুলিশ সর্বত্র অনুসন্ধান কোরলো, কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি ও তার কোন হদিশ পাওয়া গেল না। তারপর একদিন হঠাৎ হোটেল প্লাজায় এসে উপস্থিত হলো মাতাহারি।

হল্যাণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে মাতাহারিকে গুপ্তচরদের নামের যে তালিকাটী দেওয়া হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বা তার বেলজিয়ম যাত্রা সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোনো কৈফিয়ৎই দাবী করা হয় নি। সেকেণ্ড ব্যুরো শুধু উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। পররাষ্ট্র দপ্তরের ভদ্র-

লোকটীর আনুকূল্যে মাতাহারি প্যারীতে আবার আসর জমিয়ে বসলো। সরকারী কর্মচারী ও সামরিক ব্যক্তিরা—তার পূর্বের বন্ধুরা আবার ভিড় জমালো আশে পাশে। সেকেণ্ড ব্যুরো এ সময় অনুমান করছিল যে ঐ সব ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে মাতাহারি ফ্রান্সের জাতীয় নীতির বিষয় জানতে চেষ্টা করছে, যেটা জার্মান কর্তৃপক্ষের গোচরে গেলে ফরাসী জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে। চরম অসতর্কতার মুহূর্তে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে ছিটকে আসা দু একটা কথায় মিত্রপক্ষেরও ক্ষতি হতে পারে। ১৯১৭ সালের বসন্তকালে ব্রিটিশদের আক্রমণোদ্যোগ পুনরারম্ভের সিদ্ধান্ত ও সেই সময়ে ফরাসীদের নিক্রিয় থাকার কথা সে যে জার্মানদের জানিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে এমন একটা বিশ্বাসও হয়েছিল সেকেণ্ড ব্যুরোর।

প্যারীর নিশাচরদের আড্ডায় আড্ডায় গভীর রাত্রে মাতাহারি ফ্রন্ট-ফেরৎ সৈনিকদের সন্ধানে ঘুরতো—একটুকুরো খবরের আশায়। ফরাসীদের নবাবিষ্কৃত ট্যাংক সম্পর্কে জার্মানদের অদম্য কৌতূহল তাকে চরিতার্থ করতেই হবে। মাতাল সৈন্যদের কাছে নিজের শরীরটাকে ভোগ করতে দিয়ে মাতাহারি ট্যাংকের রহস্য ভেদ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। কিন্তু ফরাসী জনসাধারণ ও সাধারণ সৈনিক ট্যাংক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতো না। আর ট্যাংক ব্যবহারের পদ্ধতিও প্রত্যহ পরিবর্তন করা হচ্ছিল।

সেকেণ্ড ব্যুরোর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম হয়ে এসেছিল। বেলজিয়ম-যাত্রা সম্পর্কে তার রিপোর্ট দাখিলে অবহেলার কারণ জানাবার জন্য মাতাহারিকে এইবার সেকেণ্ড ব্যুরোর দপ্তরে নিয়ে আসা ঠিক হলো। চতুর পুলিশ অফিসার মঁসিয়ে ত্রিয়োলেত একজন সহকারীর সংগে হোটেল প্লাজায় মাতাহারির সংগে সাক্ষাৎ করলেন। মাতাহারি তখন

তার কক্ষে প্রায় নগ্ন অবস্থায় শুয়েছিল কোচে। সেকেণ্ড ব্যুরোর দপ্তরে গিয়ে তার সাক্ষাৎ করা এখুনি দরকার শুনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে আয়নার সম্মুখে নিজের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলো, বোধ হয় আমার বেলজিয়ম যাত্রা সম্পর্কে সাক্ষাৎ করতে বলেছে ?

মঁসিয়ে ত্রিয়োলেৎ বর্ণনা করেছেন, তাঁর আকস্মিক উপস্থিতি মাতাহারিকে বিন্দুমাত্র সন্ত্রস্ত করতে পারে নি। নিজের ওপর অত্যধিক আস্থাশীলতার দরুনই বোধ হয় ঐ জার্মান গুপ্তচরটী আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে মোটেই অবহিত হয় নি। নতুবা হয়তো সে পরিচ্ছদ পরিধানের অছিলায় স্থানান্তরে গিয়ে পলায়নের প্রয়াস পেত। তা না করে পুলিশ অফিসারদের সম্মুখেই সে কেশবাস ও প্রসাধন সম্পূর্ণ করে স্বাভাবিক ভাবে হোটেলের বাইরে অপেক্ষারত পুলিশ গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

সেকেণ্ড ব্যুরোর দপ্তরখানায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই তার হাতে একটী ভাঁজকরা সরকারী পত্র দেওয়া হলো। সেটী শত্রুর গুপ্তচর হিসাবে তাকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা। মাতাহারি কাগজটি পড়েও দেখলো না। সে মনে করলো তাকে যে জন্য দেখা করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কাগজটী বোধ হয় সেই মর্মে একটী অনুমতিপত্র। তাই না পড়েই পুলিশ অফিসারটীকে সে জিজ্ঞাসা করলো, কাকে দিতে হবে কাগজখানা ? মঁসিয়ে ত্রিয়োলেৎ ক্যাপ্টেন লেঁডুর দিকে ইংগিত করতেই মাতাহারি নিজের গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটী তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলে। লেঁডু সেটা পড়ে মাতাহারির অজ্ঞতা দেখে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেলেন। তারপর ওকে বসতে বলে নিজে তার পাশে চেয়ারে বসে কাগজ ও পেন্সিল টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

এখন বলুন, জার্মান সিক্রেট সার্ভিসে কতদিন ধরে আছেন ?

প্রশ্নটা মুহূর্তের মধ্যে মাতাহারিকে বিবর্ণ করে দিলে। চেয়ার থেকে সে পড়ে যাচ্ছিল। তার সমস্ত জৌলুষ নিভে গেল, সবটুকু স্বাভাবিকতা লুপ্ত হয়ে গেল। ভগ্নস্বরে কোনক্রমে সে উচ্চারণ করলো : আমি···আমি···বুঝতে পারছি না কিছু···।

—জার্মানীর গুপ্তচর এইচ ২১, বলুন কবে থেকে শত্রুর বেতনভুক হয়ে কাজ করছেন?

মাতাহারির এবার আর বুঝতে বাকী রইলো না 'লাল নর্তকীর' জীবন শেষ হয়ে গেল। তার বদলে তার একটীমাত্র পরিচয়ই উদ্ঘাটিত হলো, তা হচ্ছে : গুপ্তচর এইচ ২১।

সেরাত্রে সেণ্ট-ল্যাজার বন্দীশালার নির্জন সেলে কঠিন শয্যার ওপর শুয়ে কেবলি ছটফট করতে লাগলো বিলাসিনী গণিকা গুপ্তচর এইচ-২১।

কোর্ট অব আসিজেসে কোর্ট মার্শাল। রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে বিচার সভা বসেছে। প্রসিকিউটর, প্রতিবাদী এবং প্রয়োজনীয় দু-একজন ব্যক্তি ছাড়া বাইরের কোন লোককেই এখানে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। বিচারকদের সম্বোধন করে মাতাহারি অতি পদস্থ সামরিক ব্যক্তিদের সংগে তার সাইলেসিয়া ফ্রান্স ইতালী প্রভৃতি স্থানের সৈন্য সমাবেশ দর্শন করার বর্ণনা দিলে। এবং যারা আজ তার বিচার করতে বসেছে, তারা তার ঐসব বন্ধুদের তুলনায় পদাধিকারের দিক থেকে কত নীচে তা বোঝাবার একটা প্রয়াস পেল।

সামরিক বিচারকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, একথা কি সত্যি যে বার্লিনে নাচ দেখাতে গিয়ে সেখানকার পুলিশের কর্তার সংগে পরিচিত হয়ে তুমি জার্মান সিক্রেট সার্ভিসে প্রবেশ করো? গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারটী তোমাকে প্যারীতে বিশেষ কাজে পাঠায় ত্রিশ হাজার মার্ক

দিয়ে আর এইচ-২১ এই নামের আড়ালে তোমাকে গোপন রাখতে চেয়ে—

মাতাহারি বল্ল, যাতে আমি আমার বন্ধুদের সংগে প্রণয়সংক্রান্ত চিঠি-পত্রাদি চালাতে পারি সেজন্য ঐ নামই আমি গ্রহণ করি, আর ত্রিশ হাজার মার্ক আমি নিয়েছিলাম গোয়েন্দা বৃত্তির জন্য নয়। ওটা আমার কৃপা বিতরণের মূল্য, আমি গোয়েন্দা পুলিশের কর্তার প্রণয়িনী ছিলাম।

সন্দিগ্ধ স্বরে বিচারক প্রশ্ন করলেন, অফিসারটী অস্বাভাবিক রকমই মুক্তহস্ত বটে।

অস্বাভাবিক! ত্রিশ হাজার মার্ক অস্বাভাবিক নয়, ওটা আমার স্বাভাবিক মূল্য। আমার প্রণয়ীরা এর কমে কখনো দেয় নি—

প্রশ্ন করা হলো: আলজেরিয়া ও মরোক্কোয় জার্মানী কর্তৃক অস্ত্র সরবরাহের সংবাদ কোথা হতে সংগৃহীত হয়েছে? নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের কাছ থেকে এবং শত্রুপক্ষের নির্দেশে সেকেণ্ড ব্যুরোর আস্থা অর্জনের অভিপ্রায়ে প্রচারিতও হয়েছে।

মাতাহারি জবাব দেয়, কয়েকজন কূটনীতিকের ভোজের টেবিলে শুনেছিল সে। কিন্তু কোথায় তা কিছুতেই বলতে পারে না।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, ক্যাপ্টেন লেঁদু তোমার হাতে গুপ্তচরদের নামের যে তালিকা দিয়েছিলেন সেটা বেলজিয়মে আমাদের অন্যতম গুপ্তচরদের কাছে পৌছে দেবার কথা ছিল। কি করা হয়েছে সেটা?

কোনো জবাব দিতে পারে না মাতাহারি।

—যে এজেণ্টটীর কাছে তোমার রিপোর্ট দেবার কথা ছিল, ব্রুসেলসে জার্মানরা তাকে গ্রেপ্তার করে। প্যারী থেকে তোমার যাবার তিন সপ্তাহ পরে তাকে গুলি করে মারা হয়।

তারপর—

—মাদ্রিদে জার্মান গোয়েন্দা-প্রধানের কক্ষের পাশের কক্ষটাই তুমি দখল করেছিলে?

—হ্যাঁ।

—বার্লিনের এই চরটী তোমার সংগে হামেশাই দেখা করতো?

—হ্যাঁ।

—সে উপহার দিয়েছিল তোমায়?

—নিশ্চয়। সে আমাকে ভালোবাসতো।

—এটা তোমার এবং আমাদের জানা আছে যে আমষ্টারডামে জার্মান প্রণয়ীর কাছে তোমার প্রেরিত বার্তাগুলি গুপ্তচর এইচ ২১ বলে স্বাক্ষরিত থাকতো?

—ওটা সত্যি নয়।—তাড়াতাড়ি জবাব দিতে চায় মাতাহারি। কিন্তু একটু আগে সে স্বীকার করেছিল এইচ-২১ ছদ্মনামে সে তার জার্মান প্রণয়ীবন্ধুদের সংগে পত্র লেখালেখি করতো।

—তোমার কথাটাই এখন সত্য নয় মাদাম। কারণ মাদ্রিদের জার্মান চরটী আমষ্টারডামের সহকর্মীদের কাছে গুপ্তচর এইচ ২১ এর কাছে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রদূত মারফৎ টাকা পাঠাবার অনুরোধ করে বেতার-বার্তা পাঠিয়েছিল। প্যারীতে এসে একসময় সেই পনেরো হাজার মার্ক তুমি তুলে এনেছিলে নিরপেক্ষ দূতাবাস থেকে।

মাতাহারির আত্মরক্ষার শক্তি লোপ পেয়ে যায়। সেকেণ্ড ব্যুরো যে তার-বার্তাটীর অস্তিত্বে ওয়াকিবহাল, সে তা কল্পনা করতেও পারে নি। অবরুদ্ধ কান্নার ভারে সে ভেঙে পড়ে। তার উকিল মঁসিয়ে ক্লুনেট স্মেলিং সল্টের শিশি ও এক বাক্স চকোলেট এগিয়ে দেয় ওকে।

মাতাহারি সেগুলো সরিয়ে দিয়ে কেঁদে ওঠে, আমি শিশু নই, আমাকে ভোলাতে হবে না—

বিচারকের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মাতাহারি চীৎকার করে বলে ওঠে, আমার দেওয়া আনন্দের মূল্য ফন ক্রুন নিজের টাকার বদলে তার দেশের গভর্ণমেণ্টের টাকায় দিতে চেয়েছিল।

—তুমি স্বীকার করছো যে টাকাটা এসেছিল হল্যাণ্ডের জার্মান গুপ্তচর বিভাগের প্রধান কর্তার কাছ থেকে ?

—আমার হল্যাণ্ডের প্রণয়ীটী আমার স্পেনস্থ বন্ধুর দেনাটা চুকিয়ে দিয়েছেন মাত্র।

মাতাহারির উক্তিতে ওর উকিলই বিব্রত বোধ করতে থাকে। ফন ক্রুনের গভর্ণমেণ্টের টাকা দিয়ে নিজের দেনা চুকোনো এবং স্পেনের বন্ধুর স্ফূর্তির জন্য তার জার্মান প্রণয়ীর টাকা দেওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?

এরপর কোর্ট সেদিনকার মতো স্থগিত রইলো। পরদিন মঁসিয়ে ক্লুনেট সাক্ষীদের জেরা শুরু করেন। প্রথম সাক্ষী হলেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীটী, শেষবার ফ্রান্সে এসে মাতাহারি যার সংগে কয়েকদিনের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল। লোকটীর চেহারায় বিচক্ষণ ও অভিজাত কূটনীতিজ্ঞের ছাপ পরিস্ফুট। সাক্ষ্য দিতে এসে খানিকটা বিব্রত বোধ করেছে এমন ভাব তার মুখে।

বিচারকর্তা বল্লেন, এঁকে ডেকেছেন কেন ?

মাতাহারি জবাব দিল, ফ্রান্সের উচ্চতম পদগুলির একটীর অধিকারী ইনি। নিশ্চয়ই ইনি গভর্ণমেণ্টের নীতি আর প্রস্তাবিত সামরিক পরিকল্পনার কথা জানেন। মাদ্রিদ থেকে ফিরে এসে এর সংগে প্রথম আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর ইনিই আমার প্রথম

বন্ধু। তাই আনন্দের সংগে আমরা একত্র মিলিত হয়ে তিনদিন কাটাই। একে জিজ্ঞাসা করুন কোনো সংবাদ আমি এর কাছ থেকে পেতে চেয়েছিলাম কিনা কিম্বা ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে কোনো গুপ্ত তথ্য জ্ঞাত হয়ে লাভবান হবার চেষ্টা করেছি কিনা—

সাক্ষী জবাব দিলেন, মাদাম কখনো এই ধরণের প্রশ্ন আমায় করেননি।

কোর্ট মার্শালের সভাপতি বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, তবে তিনদিন ধরে কি কথা আপনাদের হয়েছিল? জাতি যখন যুদ্ধরত, তখন ঐ ধরণের কথাবার্তাই তো স্বাভাবিক।

—আমরা আর্ট, কেবল ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম—

এরপর ফ্রান্সের একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর একটা পত্র পাঠ করা হলো। মাতাহারির সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পূর্ণ পত্রটা। বলা বাহুল্য এগুলিতেও মাতাহারির পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হলো না। তারপর তার উকিল মঁসিয়ে ক্লুনেট বক্তৃতা দিলেন। যেই বক্তৃতাটি আজো প্রকাশিত হয়নি। এর পর বিচারকার্য সমাপ্ত বলে ঘোষণা করা হলো। এবং দশ মিনিট পরামর্শের পর কোর্ট-মার্শালের বিচারকমণ্ডলী একমত হয়ে রায় দিলেন:

রূপ ও সৌন্দর্যময়ী এবং ব্যক্তিত্বময়ী এই নারীকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা বিভৎস হলেও চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রজালে সে বিপত্তির পর বিপত্তির সৃষ্টি করেছে, মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনো শাস্তিই তার প্রাপ্য নয়।

জুনের মনোরম সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় যখন তার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখন কি ঐ নর্তকীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছিল সেই বিরাট বাহিনীর মার্চের পদধ্বনি যা পরম বিশ্বাসে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল তারই চক্রান্ত-বিলাসে?

বৃদ্ধ ব্যবহারাজীবী, মাতাহারির ভক্ত ও প্রণয়ী মঁসিয়ে ক্লুনেট কোর্ট রুমে কেঁদেছিল সুন্দরী নর্তকীর শেষ পরিণতির কথা ভেবে। আর মাতাহারি শুদ্ধ, উদাসীনভাবে শুনছিল মৃত্যু-পরোয়ানার হুঁসিয়ারী। মাঝে মাঝে অদ্ভুত একটা হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠছিল, তারপর যখন ঘোষণা পাঠ শেষ হয়ে গেল, আর যখনই তার উপলব্ধি হলো মৃত্যু নিকটবর্তী, তখন ফিরে তাকালো, আর অপ্রতিভভাবে ঠোঁট দুটো চেপে ধরলো।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার কোনো বক্তব্য আছে কিনা, জবাবে সে বলেছিল, না; আর যদি থাকেও বা, তোমাদের কাছে তা বলতে যাবো না।

—কোনো শেষ ইচ্ছা?

—আছে। ইচ্ছা হয় ক্যাপ্টেন মারভকে দেখতে। কিন্তু সে তো রাশিয়ায়। তোমাদের অনুমতি পেলে তাকে একটা চিঠি লিখে যেতে পারি।

তিনটি চিঠি সে লিখে যায়। একটী কন্যার উদ্দেশ্যে—সুন্দর একখানি চিঠি, বিজ্ঞ হিতৈষী জননীর উপদেশ-ভরা চিঠি। একটী পররাষ্ট্র দপ্তরের সেই উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকটীর উদ্দেশ্যে—যিনি সকলের ঘৃণার সম্মুখে সাহসের সংগে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন মাতাহারির স্বপক্ষে। আর একটী রাশিয়ায় মারভের উদ্দেশ্যে।

মাতাহারির মৃত্যুর পর ইউরোপ-আমেরিকায় তার সম্বন্ধে বহু অলীক কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত ঘটনাবলী যতদূর সম্ভব বর্জন করে তার জীবনের সঠিক ইতিহাস প্রতিফলনের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক মেজর টমাস কুলসন—মাতাহারির

ক্রিয়াকলাপের উত্তাপ যাঁর রেজিমেণ্টকেও স্পর্শ করেছিল, তাঁর বিবরণী অনেকখানি প্রামাণ্য মনে করা যেতে পারে। স্পেনের স্তাভাল এ্যাটাচি মাতাহারির শেষবারের প্যারী-যাত্রার প্রাকালে আমষ্টারডামের জার্মান সিক্রেট সার্ভিসে তার যাত্রার কথা জানিয়ে তার জন্য ত্রিশহাজার মার্ক পাঠাবার অনুরোধ করে যে সাংকেতিক ভাষায় তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন, মেজর কুলসনের মতে, সেই সাংকেতিক ভাষার সমাধান-সূত্র দৈবক্রমে ইতিমধ্যে ফরাসীদের হস্তগত থাকায় তারবার্তার মর্মার্থ বোধগম্য হতে দেরী হয়নি। মার্কিন সাংবাদিক কার্ট সিংগার এ-প্রসংগে ভিন্ন কথা বলেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য সেটা উধৃত করে দিচ্ছি।

স্পেনে নৃত্য-প্রদর্শনের চুক্তিতে মাতাহারি যখন মাদ্রিদে আসে, তখন স্পেনস্থ জার্মান স্তাভাল এ্যাটাচির সংগে তার প্রগাঢ় হৃদ্যতা জমে। মাদ্রিদের বিখ্যাত নৈশক্লাব ত্রোকাদেরোতে রাতের পর রাত ওরা আসতো দুজনে। স্তাভাল এ্যাটাচি ভদ্রলোকের প্রুশিয় আভিজাত্য মুগ্ধ করেছিল মাতাহারিকে। প্রথম দিনের চটুল আলাপ ক্রমশ দুজনের মধ্যে পরিণত হলো ভালোবাসায়। মাতাহারিকে যুবক অফিসারটী বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিলে।

প্যারীতে গিয়ে মাতাহারি যখন একদিকে নাচের আসর জমিয়েছিল আর অন্যদিকে গুপ্তচরের কাজ করছিল, তখনো তার মন প্রতিশ্রুতির রঙীন স্বপ্নে মসগুল। অফিসারটী জানিয়েছিল প্যারী থেকে ফিরে এলে মাতাহারিকে বিবাহ করে বার্লিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু দিন যত অতিবাহিত হতে লাগলো, স্পেন থেকে অফিসারটীর চিঠিগুলিও তত নীরস হয়ে আসছিল। আশ্চর্য, ছলনাময়ী পুরুষের ছলনার কাছে পরাস্ত হয়েছিল। যুবক অফিসারটীর কর্তব্য আগে—পরে প্রেম। আর মাতাহারি জার্মান নয়, প্রুশিয় নাগরিকের সংগে বিবাহের স্বপ্ন দেখা

তার পক্ষে স্পর্ধা। মাতাহারি জানতেও পারেনি যে সে ওর কাছে শুধুমাত্র জার্মান গুপ্তচর এইচ-২১ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু মাতাহারি বিবাহের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়বার স্পেনে এসে তার সংগে দেখা করলো। যুবক অফিসার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার জবরদস্তিতে।

জোর করে সে মাতাহারিকে প্যারীতে পাঠিয়ে দিল। আর ইচ্ছা ছিল না তার সেখানে ফিরে যাবার। আশংকা তার হৃদয়কে দুর্বল করে দিয়েছিল। তবু তাকে যেতে হবে। জার্মান কর্তৃপক্ষের হুকুম—*mag es kosten was es will*—যে কোনো মূল্যে, যে কোনো উপায়ে।

যে সাংকেতিক বার্তায় মাতাহারির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রুশিয় যুবক এ্যাটাচি জানতো ফরাসীরা এর মর্ম সহজেই উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হবে। তবু ইচ্ছা করেই সে ঐ বার্তার সাহায্য নিয়েছিল। ফরাসীরা তাকে বধ করে নি, তাকে হত্যা করেছিল স্পেনের জার্মান দূতাবাসের ক্ষমতাগর্বী প্রুশিয় নৌ-কর্মচারী।

• মার্থা ম্যাকেনা

মার্থা ম্যাকেন্না

উইনষ্টন চার্চিল বলেছেন, রণক্ষেত্রের মৃত্যু-উন্মাদনার মধ্যে যুদ্ধরত সৈনিকের শৌর্য, সাহস ও আত্মত্যাগের চাইতেও দিনের পর দিন শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তের ধরা পড়ার আশংকার মধ্যে একাকী কর্মরত গুপ্তচরের জীবনবৃত্তি ঢের সাহসিকতাপূর্ণ।

এমনি সাহসিক ও রোমাঞ্চকর মার্থা ম্যাকেন্নার কাহিনী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা যখন বেলজিয়ম আক্রমণ করে দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল, তখন এই বেলজিয়ান মহিলাটী স্বদেশপ্রেমীর কর্তব্য হিসাবে মিত্রশক্তি ব্রিটিশদের পক্ষে গুপ্তচরের জীবনবৃত্তি অবলম্বন করে।

জার্মান সৈন্যব্যূহের পশ্চাতে থেকে সে অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ আহরণ করে ক্রমাগত ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কাছে প্রেরণ করেছিল। তাছাড়া জার্মানদের গোলা-বারুদের স্তূপ ধ্বংস করেছিল বা করবার চেষ্টা করেছিল; মার্থা ব্রিটিশ বন্দীদের পলায়নে সহায়তা করেছে; ক্যাম্প, ব্যারাক ও সৈন্য সমাবেশগুলির বর্ণনা দিয়ে ব্রিটিশ বিমানগুলির আক্রমণের সুবিধা করেছিল আর এইভাবে তার স্বদেশের শত্রু জার্মান সৈন্যদের হাজারে হাজারে নির্মূল করেছিল। জার্মান হাসপাতালে নার্সের জীবিকা গ্রহণ করে মার্থা আহত সৈন্যদের অক্লান্ত শ্রম ও শুশ্রূষা দিয়ে সেবাও করেছে। এজন্য যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানরা তাকে আয়রন ক্রশ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল।

শত্রুকবলিত মাতৃভূমির সেবায় স্বদেশপ্রেমীর সর্বোচ্চ কর্তব্য সম্পাদনে মার্থা ম্যাকেন্না জীবন বিপন্ন করে তার জীবনকেই অলংকৃত করেছিল। অন্যদিকে, শত্রু-মিত্রনির্বিশেষে আহত সৈনিকদের আন্তরিক সেবাকার্যের মধ্যে তার মহত্তর হৃদয় যেন স্বদেশ-সেবার প্রেরণাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এদিক থেকে তার চরিত্রের অদ্ভুত মিল দেখা যায় নার্স এডিথ ক্যাভেলের সংগে।

মার্থার চতুরতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রী চার্চিল ১৯১৯ সালে তার কাছে সম্রাটের প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তার

জীবনকাহিনী পড়ে তিনি বলেছেন, মার্থার গল্প এতই রোমাঞ্চকর যে পড়তে আরম্ভ করে ভোর চারটে না হওয়া পর্যন্ত আলো নিভাতে পারিনি।

মার্থার আত্মকাহিনী সত্যি চমকপ্রদ।

১৯১৪ সালের ২রা আগষ্টের রাত্রিবেলায় বেলজিয়মের ওয়েষ্ট্রসবেকের পুরোনো গোলাবাড়ীর রান্নাঘরে ঢুকে আমার বাবা বল্লেন, জার্মানরা বেলজিয়ম আক্রমণ করেছে। রাজা আলবার্ট রণসজ্জার হুকুম দিয়েছেন। পয়লা ট্রেণেই আমাদের ছেলেরা তাদের ডিপোর উদ্দেশে যাত্রা করবে। ঈশ্বরই জানেন কি ঘটবে! জার্মান দস্যুদের রুখতে পারবে না বেলজিয়ম।

মা আমাকে বল্লেন, মার্থা, বাইরে গিয়ে ছেলেদের নিয়ে এসে খবরটা জানিয়ে দাও। তারপর বাবার দিকে ফিরে বল্লেন, এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। দস্যুদের রুখবার জন্যে ফরাসীরা শীঘ্রই আমাদের ছেলেদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে আসবে।

ওয়েষ্ট্রসবেকে আমরা এইভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের কথা শুনলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না। তারপর ক্রমশ লড়াইয়ের আবহাওয়ায় সরগরম হয়ে উঠতে লাগলো আমাদের গ্রামটী। দিনের পর দিন ধরে নানা গুজব ফ্লাণ্ডার্সে প্রচারিত হতে থাকলো। তারপর একদিন শোনা গেল দূরাগত কামানের গর্জন। রাত্রির আকাশের দিগন্ত রেখায় দেখা যেতে লাগলো তীব্র আলোকরেখার আকস্মিক বিচ্ছুরণ। পিছু হটতে লাগলো আমাদের সৈন্যেরা। লীজের পতন হলো, লুডেনডর্ফের লৌহ পদক্ষেপের নির্মম পেষণে ধূলিসাৎ হলো তার অনেকগুলি বন্দর। প্রত্যহ প্রভাতে আমরা শুনতাম দুর্ধর্ষ জার্মান

সৈন্যবাহিনী ক্রমশ নিকটতর হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা যেন বিশ্বাস করতে পারতাম না আমাদের গ্রামের রাস্তাগুলিতেও একদিন লৌহ শিরস্ত্রাণ পরা লোকগুলিকে দেখতে পাবো।

জার্মানদের অগ্রসর হওয়ার সংগে সংগে অধিকৃত গ্রামগুলি থেকে আশ্রয়প্রার্থীরা আমাদের গ্রামে এসে ভিড় করতে লাগলো। ওয়েষ্ট্র সবেক যেন প্রকাণ্ড একটী সাময়িক শিবিরে পরিণত হলো। আমাদের বাড়ী, খামার, গোলা সবই ভরে গেল শরণার্থীদের ভিড়ে। গ্রামের কোনো বাড়ীই বাকী রইলো না। একদিন জনশ্রুতি রটলো ব্রিটিশরা আসছে। থ্যাবড়া গোলাকার ক্যাপ ও সর্ষে রঙের উর্দি-পরা গোঁফওলা ব্রিটিশ অশ্বারোহী বাহিনী এসে দেখা দিল, তারা কয়েকদিন পরেই চলে গেল। তারপর ফরাসীদের অশ্বারোহী বাহিনীর দুটো স্কোয়াড্রন এসে হাজির হলো। আমাদের বাড়ীটাকে তারা এসেই খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

গ্রামের ধারেই ছোট পাহাড়টার ওপর বাড়ীটা অবস্থিত থাকার জন্য গোটা জনপদটা দেখা যেত আমাদের বাড়ী থেকে। একজন লেফ্টেন্যান্ট আমাদের এখান থেকে চলে যাবার পরামর্শ দিয়ে বল্লেন, একটু পরেই আমাদের লোকলস্কর সব এসে পড়বে। বেশী দিন আমরা ওই হতভাগাদের আটকাতে পারবো না, আমাদের কিছু নেই বল্লেই হয়!

ঘর্মাক্তকলেবর অশ্বারোহী বাহিনীর লোকেরা আমাদের বাড়ীটা দখল করে বসলো। ওরা দেয়ালে ছোট ছোট গর্ত করতে লাগলো আর জানালাগুলো ফার্নিচার দিয়ে চেপে রাখলো। তারপর হঠাৎ একসময় বন্দুকের গুলির আওয়াজে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। নীচের তলায় সেলারে গিয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম।

শীঘ্রই ফরাসীরা চলে গেল। কৌতূহলবশত উঠে এসে জানলার মধ্য দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম কাঁধে ঝুলন্ত রাইফেল নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে জার্মান সৈন্যেরা ওয়েষ্ট্র সবেকের দিকে আসছে।

হঠাৎ রান্নাঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। জার্মান ভাষায় আমার ভালোরকম অধিকার ছিল, তাই আমি নেমে এলাম চরম বিপদ কি হতে পারে জানতে; খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করছিল একজন যুবক জার্মান অফিসার, বেশবাস বিশৃঙ্খল ও নোংরা। তার কাঁধের আড়াল দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল আরো অনেক সৈন্যদের বেয়নেট ঝকমক করছে।

জার্মান সৈন্যরা সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লুঠ করার পর আমাদের বাড়ীটাতে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর সমস্ত গ্রামটীতে দিনের পর দিন ধরে চলতে লাগলো ত্রাসের রাজত্ব। গ্রামের পুরুষদের ও মেয়েদের ধরে এনে পৃথক পৃথক ভাবে বন্দীকৃত অবস্থায় রাখা হলো জার্মান সংগীনের প্রহরায় সম্মুখে। আমরা মেয়েরা রইলাম একটী পুরোনো বাড়ীর সেলারে চৌদ্দ দিন ধরে বন্দী। দিনে একবার মাত্র খাদ্য ও জল সংগ্রহের জন্য বাইরে আসতে পেতাম। সেই সেলারে হাওয়া ঢুকতো অল্প, কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে যাদের শয্যাদ্রব্য ছিল না, তাদের রাতগুলি কি দুঃসহ না লাগতো। রাত্রে যথেষ্ট পরিমাণ আগুন জালাবারও হুকুম ছিল না আমাদের। সামান্য পরিমাণ জল সরবরাহ করা হোতো, কিন্তু তাতে সেলার পরিষ্কার করা যেত না, বা স্যানিটারী ব্যবস্থা চলতো না। মনে হয়েছিল জার্মানরা বুঝি আমাদের ভুলেই গেছে।

এরপর হঠাৎ একদিন হুকুম এলো ছেড়ে দেবার। আমরা ও পুরুষরা সবাই মুক্ত হলাম। এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে এসে উঠলাম

আমরা। যুদ্ধের প্রথম কটা দিনের উন্মত্ততা ও উত্তেজনা প্রশমিত হবার পর মনে হলো জার্মানরা এখন খানিকটা নরম হয়ে এসেছে।

ওয়েষ্ট্রুসবেক এখন জার্মান সৈন্যদের মধ্যবর্তী অবস্থান-স্থল হয়ে উঠলো। আর ফ্রন্টের ঠিক পেছনকার হতাহতের চিকিৎসা-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। পথের ধারের বড় বাড়ীটায় কয়েকজন পাদ্রী-মহিলা হাসপাতাল স্থাপন করে আহত জার্মান ও মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের শুশ্রূষা করছে শুনলাম।

নার্সিংয়ে আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। আহতদের সেবায় আমারো সাহায্যের প্রয়োজন আছে ভেবে একদিন সেখানে গেলাম।

আমাকে পেয়ে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠলো। সেই বড় বাড়ীটায় আহতরা বিছানা, মেঝে, শোফার ওপরে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। কারুর পচনশীল ক্ষত, কারুর হাত পা উড়ে গেছে। একজন মাত্র ডাক্তার ও তুজন অর্ডারলি কাজ করছে সেখানে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে মিত্রশক্তির অনুকূলে এসেছিল। ওয়েষ্ট্রুসবেকে ক্রমাগত মিত্রপক্ষীয় কামানেব গোলা পড়তো। একদিন কম্যাণ্ডাণ্ট ডেকে বল্লেন আমাকে, ফ্রয়লাইনা, জায়গাটা এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তুমি চমৎকারভাবে কাজ করছো, তোমাকে রুলাসে কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করে দিচ্ছি, সেখানেই তোমাকে কাজ করতে হবে। শৃঙ্খলা-ভংগের অজুহাতে আমার বাবাকে জার্মানরা নিয়ে গিয়েছিল রুলার্সে—সেখানকার বন্দীশিবিরে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে শুনেছিলাম। তাই মাকে নিয়ে রুলার্সে একটী মহিলার বাড়ীতে আশ্রয় নেবার পরই বাবাব সন্ধান করতে লাগলাম। হাসপাতালের কাজে জার্মান কর্তৃপক্ষ আমার ওপর খুশি থাকায় বাবার খবর পেতে বিশেষ বিলম্ব হলো না এবং তিনিও একদিন প্রহরাধীন অবস্থায় আমাদের দেখে গেলেন।

ক্লার্সের হাসপাতালে আমাকে সাদরে গ্রহণ করা হলো। হাসপাতালে আমিই একমাত্র নার্স। রাত্রে সেখানে সান্ধ্য-আইনের কড়াকড়ি। প্রয়োজন হলে রাত্রেও এসে যাতে ডিউটি দিতে পারি, এজন্য আমাকে রাত্রির চলাফেরার মঞ্জুরীনামা দেওয়া হলো!

একপক্ষকাল পরে, নাইট-ডিউটি সেরে সবেমাত্র সকালে বাড়ী এসেছি হঠাৎ আমাদের খিড়কির দরজার হাতল ঘুরিয়ে নিঃশব্দে একজন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। লুসিল ডেল্ডন্ক! আমি অবাক হয়ে গেলাম তাকে দেখে—ওয়েষ্ট্ সবেকে বন্দী থাকার সময় একদিন সে অন্তর্হিতা হয়। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে আমাদের চুপ থাকতে বলে ফিস্ ফিস্ করে সে বল্ল, কেউ যেন না জানতে পারে আমি এসেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা থেকে তুমি আসছো লুসিল?

সীমান্তের ওপার থেকে। তোমার জন্য সংবাদ আছে। তোমাদের তিন ছেলেই ভালো আছে সৈন্যবাহিনীতে। আমাদের সবাইও ভালো আছে, কিন্তু মাত্র এই খবর দেবার জন্যই আমি হল্যাণ্ড থেকে চল্লিশ মাইল হেঁটে আসিনি। কারণ জার্মানরা যদি জানে আমি এখানে তাহলে—

কথা বন্ধ করে আশেপাশে একবার দেখে নিল সে। তারপর বল্ল, মার্থা, তোমার বয়স অল্প আর বেশ শক্ত মেয়ে তুমি। তোমার স্বদেশকে সেবা করতে চাও না?

সে কি বলতে চায় বুঝতে পারলাম। গুপ্তচর। আমি জানতুম বেলজিয়মে অনেক গুপ্তচর আছে, তারা তাদের স্বদেশকে সেবা করছে। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তিকে তখনো পর্যন্ত আমি উদারতার চোখে দেখতে শিখিনি! কিন্তু মা বলে উঠলেন, আমার তিন ছেলেকে আমি দেশের সেবায় ছেড়ে দিয়েছি। মার্থাকেও আমি দেশের জন্য ছেড়ে দিতে পারি স্বচ্ছন্দে, সে যদি চায়।

লুসিল বল্ল, একাজে তোমার প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত বিপদের সম্ভাবনায় কণ্টকিত হয়ে উঠবে। তুমি কি বলো মাথা?

আমি বল্লাম, আমি তোমার উপদেশ প্রার্থনা করছি।

লুসিল বল্ল, ব্রিটিশ গোয়েন্দা কমিশনই তোমাকে উপদেশ দেবে। আমি এখন চলে যাচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি তোমার নির্দেশ পাবে। যে ভাবে বা যেখান থেকেই তা আসুক না কেন, মোটেও বিস্মিত হবে না।

লুসিল যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎই চলে গেল। আমি আর মা পরস্পরের মুখের পানে শুধু তাকিয়ে রইলাম।

আমাদের এখানে সব্জী ও ফল বিক্রি করতে আসতো একটী বৃদ্ধা—বয়স তার প্রায় সত্তর বছর। বেশ হাসিখুসি। জার্মান সৈন্যেরা তাকে 'ক্যান্টিন-মা' বলে ডাকতো। জার্মানদের ক্যান্টিনে তার ফল সরবরাহ করার অর্ডার ছিল বলে তাকে ইচ্ছামত চলাফেরা করার পাশ দেওয়া হয়েছিল। লুসিলের আসার তিনদিন পরে একদিন ভোরে হাসপাতালে যাবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় ক্যান্টিন-মা তার সব্জী ও ফল বোঝাই ঝুড়ি নিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো, ভালো বিন, খুব সস্তা, নেবে নাকি গো?

সিঁড়ির গোড়াতে দাঁড়িয়েছিলাম, ক্যান্টিন-মা ঝুড়িটা সেখানে রাখতে গিয়ে হঠাৎ আমার হাতের ভেতর একটা পাকানো কাগজ গুঁজে দিল। তারপর বল্ল, তোমার শোবার ঘরে চুপিচুপি দেখো গিয়ে। আমি তাড়াতাড়ি ওপরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে কাগজটা খুলে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে:

জভাজিল যাবার পথের ডানদিকের দ্বিতীয় গোলাবাড়ীতে এসো। লিসেটির সংগে দেখা করবে, সে আজ রাত ন'টায় তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে।

নির্দেশমত আমি ওদের সংগে সাক্ষাৎ করার সংকল্প করলাম। একবার ভাবলাম এটা হয়তো বার্লিন 'ভ্যামপায়ার'দের (জার্মান গোয়েন্দা পুলিশ) ফাঁদ হতে পারে। তবু আমি ঠিক করলাম কথামত দেখা করবো।

সেই দিন সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে আমি উপস্থিত হলাম গোলাবাড়ীর পিছন দিককার দরজার সামনে। কি এক অজানা অনুভূতিতে আমার হৃদয় কাঁপছিল। দরজায় অল্প আঘাত করতেই টুক করে সেটা খুলে গেল, তারপর লিসেটির সংগে দেখা করবো বলতেই অন্ধকারে একটা হাত আমার হাত ধরে আমাকে আরো অন্ধকারময় সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে পিছনদিককার একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল।

লুসিল সেখানে ছিল। আমাকে দেখে বল্লে, তুমি এসেছ বলে আমি খুব খুশি। আজ থেকে স্বেচ্ছায় তুমি তোমার দেশের বর্তমান শাসকদের শত্রুদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করলে। রুলাসে হাসপাতালের নার্স হওয়ার জন্যে তোমার সংগে অনবরত শত্রুপক্ষের সকল শ্রেণীর সৈন্যদের সংস্রব ঘটছে। সেই দিক থেকে তুমি সুযোগ পেতে পারো সৈন্যচলাচল, সামরিক অবস্থিতি, গোলন্দাজবাহিনী আর কামান শ্রেণীর সমাবেশ, সরবরাহের অবস্থা, আরো নানা রকম খবর জানবার। তোমার কাছে যে সব নির্দেশ আসবে, সেগুলো পালন করা ছাড়া যুদ্ধের অন্যান্য খবরাখবর জানিয়ে দেওয়াও হবে তোমার কর্তব্য।

আমি প্রশ্ন করলাম, খবরগুলো কি ভাবে পাঠাবো?

লুসিল বল্লে, সব বিষয়ই তোমাকে বলছি। ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্সের কাছে তোমার পরিচিতি হবে 'লরা' নামে। সংকেত লিপির সূত্র

তোমাকে দেবার পর তুমি ভালো করে সেটা মুখস্থ করে নিয়ে নষ্ট করে ফেলবে। এই লিপির সাহায্যে তুমি বার্তা লিখে জানাতে পারবে।

লুসিল আমাকে সংকেত-সূত্র লেখা কাগজটা দিতেই আমি সেটা আমার মোজার মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে গেলাম। কিন্তু বাধা দিয়ে লুসিল বলে উঠলো, বিপজ্জনক কাগজপত্র লুকোবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান ওখানটা নয় মার্থা। সন্দেহ হলে পুলিশ আগে ওই জায়গাটাই তল্লাশ করে। কাগজটা চুলের মধ্যে ঢেকে নাও। এবার দরকারী কথাগুলো শোনো। ক্যান্টিন-মা তোমার কাছে নির্দেশ পৌছে দেবে। আর তুমি তোমার জবাব বা বার্তা পাঠাবে আমাদের ৬৩ নম্বরের কাছে। সংকেতলিপি তৈরী করার পর রুয়ে-ড্য-লা-প্লেসের মধ্য দিয়ে গ্রাণ্ড প্লেসে যাবে। ডানদিকে সরু চলন-পথ দেখতে পাবে। সেখানে গিয়ে বাঁ দিকের পঞ্চম জানালার গায়ে প্রথমে তিনবার তারপর একটু থেমে দুবার ঘা দেবে। ৬৩ নম্বরের কাছ থেকে বার্তাগুলো বিভিন্ন লোক মারফৎ সীমান্ত পেরিয়ে পৌছে যাবে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স সেকশনের কাছে।

লুসিল তারপর সেফ্‌টি-পিন-ম্যানদের কথা বল্লে। সে জানালো, এরা জার্মান গোয়েন্দা-পুলিশের বিরুদ্ধে চমৎকার ও বিপজ্জনকভাবে কাজ করছে। কয়েকদিনের মধ্যে একজন আমার সংগে নাকি দেখা করবে। সে যদি তার কোটের কলারের নীচে আঁটা দুটো সেফটীপিন দেখায়, তাহলে আমি যেন আমাদের গৃহকর্ত্রীকে বলে তার একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিই। কোনো বিশেষ কাজে সে লোকটি আসছে এখানে।

দুদিন পরে মধ্যবয়সী সুশ্রী চেহারার একটি লোক এসে আমার খোঁজ করলো। আমার সংগে দেখা হতেই সে বল্লে, লড়াইয়ের চোটে যারা

সবকিছু হারিয়েছে আমি তাদের একজন। একটু আশ্রয় চাই এখানে। শুনলাম এখানে নাকি ভালো বেতনের কাজকর্ম পাওয়া যাচ্ছে—

তাকে ভেতরে আসতে বলে আমি জানালাম যে গৃহকর্ত্রীকে বলে যদি কিছু সম্ভব হয়তো করবো। লোকটি ভেতরে আসার পর চতুর্দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে দেখে নিলে। তারপর তার কোটের কলার তুল্লে মুহূর্তের জন্য। এবং আমিও সেই স্বল্পকালের মধ্যে দেখে নিলাম দুটো ধাতুনির্মিত সেফটিপিন আঁটা রয়েছে তার কলারের নীচে।

লোকটীর কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে গৃহকর্ত্রী তাকে ওপরের তলার একটি ঘর ভাড়া দিলে। বাড়ীতে সেইটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে লোকটি বাড়ীর লোকদের সংগে বেশ ভাব জমিয়ে ফেল্ল। এমনকি যে দুজন জার্মান অফিসার ছিল, তাদের সংগেও। বেশ চমৎকার জার্মান বলতে পারে লোকটা, ফরাসী ও ফ্লেমিশ ভাষায়ও তার ভালো রকম দখল ছিল।

ভারী আমুদে, মিশুক আর হাসিখুসি লোকটি! জার্মান অফিসার দুটোর সংগে তার এমন হৃদ্যতা জমে উঠলো যে প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই দেখা যেতে লাগলো ওরা তিনজনে পানোন্মত্ত হয়ে সিঁড়ির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। অবশ্য এই লোকটি যে ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামাল হবার ভান করতো এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, কারণ একদিন সিঁড়িতে ওই অবস্থায় আমার দিকে চকিতে চোখ টিপে ইশারা করেছিল।

সাতদিনের মধ্যে নবাগত লোকটি একবারও আমাকে কোনো কথা বলেনি কিম্বা বলার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষাও করেনি। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় পাকশালায় অগ্নিকুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে টানতে আমাকে দেখে নিচু গলায় বলল, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, না? তারপর আবার সেই প্রথম দিনকার মত আশে পাশে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ

করে সিগারেট কেস থেকে পাকানো একটা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল, এটা কি করতে হবে বোধ হয় জানেন আপনি ?

এই আমার প্রথম কাজের শুরু। রোমাঞ্চিত বোধ করলাম, তবু যথাসম্ভব শান্তভাবে জবাব দিলাম, আজ রাত্রেই এটা পাচার হয়ে যাবে।

ফায়ারপ্লেসের দিকে লোকটি তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ আমি প্রশ্ন করলাম, এখানে কি করছেন আপনি ?

গোয়েন্দাগিরি, লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, একটা কথা আপনাকে বলবো মাদামোঁয়াজেল। আমরা সেফটি পিন-ম্যানরা একা একাই কাজ করা সংগত মনে করি, তবু ভবিষ্যতে কখনো কোনো সেফটি-পিন-ম্যান আপনার সাহায্য চাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে আপনি লক্ষ্য করবেন সেফটি-পিন কিভাবে বসান আছে। নোতুন নিয়মে সেগুলি কোটের কলারের নীচে আড়াআড়ি ভাবে বসানো থাকবে—উলটো ভাবে থাকতে দেখলে আপনি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন এমনি ভাব দেখাবেন। নিশ্চয়ই জানবেন লোকটা তাহলে জার্মান ভ্যাম্‌প্যায়ার। জার্মান গোয়েন্দারা কলারে সেফটি-পিন এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে আমাদের খোঁজে—আমি এই সব ভ্যাম্‌প্যায়ারদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সেই রাত্রে লুসিলের নির্দেশিত ৬৩ নম্বরের জানলার ধারে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন অব্যক্ত উত্তেজনায় আমার পা দুটো কাঁপছিল। জানলায় সংকেত করার একটু পরেই একটি হাত—অন্ধকারের পটভূমিকায় একটি শাদা হাত বেরিয়ে এলো বাইরে। আমি সেই মূল্যবান কাগজটি তার মধ্যে গুঁজে দিতেই হাতটি মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হলো, সেই মুহূর্তে জানলাটিও বন্ধ হয়ে গেলো।

রুলাসে'র রেল-ষ্টেশনে সপ্তাহে একবার করে গোলা-বারুদ বোঝাই ট্রেন এসে দাঁড়ায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেনের মাল খালাস হয়ে যায়। এই তথ্যটুকু আমি জেনে নিয়ে ছিলাম, শুধু জানতাম না কবে এবং কখন এসে ট্রেন দাঁড়াবে। এটুকু লক্ষ্য করেছিলাম যে ট্রেন আসার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই, আর প্রত্যেক সপ্তাহে বার-বদল হয়।

একটি সপ্তাহান্তিক ট্রেনের আসার দিন ও সময় জানতে পারলে ৬৩ নম্বরের মারফৎ খবরটি ব্রিটিশ বিমান-বহরকে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং ষ্টেশনটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় বোমার ঘায়ে। খবরটা পাওয়া যেতে পারে জার্মান সামরিক রেল-চলাচল বিভাগের কোনো কর্তা-ব্যক্তির কাছ থেকে—এই আশায় এমনি কোনো একজনের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপনেব ইচ্ছায় কয়েকদিন ধরে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেড়াতে লাগলুম।

ষ্টেশনে যাওয়া আসায় আমার পক্ষে কোনো বাধাই ছিল না, কারণ ট্রেনে যে সব আহত সৈন্য আসতো, তাদের নামিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে হতো হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

একদিন বিকালে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছি, পিছন থেকে মোটা গলায় বলতে শুনলাম, ফ্রয়লাইন, আপনাকে প্রায়ই এখানে আসতে দেখে ভারী আনন্দিত হই—

বেঁটে মোটা একজন অফিসার মৃদু হাসির সংগে আমাকে অভিবাদন করলে। আমিও মিষ্টি হেসে বল্লাম, আজকের চমৎকার আবহাওয়া উপভোগ করার জন্যই বেড়াচ্ছি। হাসপাতালে এখন কাজের চাপ কম, হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় রয়েছে। হের হেপ্টম্যান*, আপনারা অবশ্য খুবই কাজে ব্যস্ত এখন—

---

* জার্মান সেনাবাহিনীতে হেপ্টম্যানের মর্যাদা ব্রিটিশ সৈন্যদলে ক্যাপ্টেনের সমান।

অফিসারটি বল্‌ল, কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রথম আমারও কাজের চাপ হাল্কা। তারপর সিগারেট দিতে এল আমায়। আমি প্রত্যাখ্যান করতেই সে আমাকে তার অফিসে নিয়ে গিয়ে চা পানের প্রস্তাব জানালো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পরস্পর হৃদ্য আবহাওয়ায় জমে গেলাম। ওর হাত আমার হাতের খুব কাছাকাছি এগিয়ে এল। হঠাৎ সেই মুহূর্তে টেলিফোনের ডাক আসতেই অফিসারটি উঠে গেল, কয়েক মিনিট পরে এসে বল্‌লে, জরুরী কাজের তাগিদ এসেছে ফ্রয়লাইন।

আমি উঠে পড়লাম। সে বল্‌ল, একটা সময় ঠিক করা যায় না, যখন আমরা উভয়েই অবকাশ পাবো একত্রিত হবার?

আমি বল্‌লাম, আজ সোমবার, এই হপ্তার কোন দিনটায় আপনার কাজের চাপ কম থাকবে?

নোট-বুক বার করে দেখতে লাগলো সে। তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে আমি বেশ দেখতে পেলাম বুধবারের তারিখে লেখা রয়েছে: গোলা-বারুদের ট্রেন—রাত তিনটেয় আসছে, যাচ্ছে বেলা তিনটেয়। শেষের হুকুম অনুযায়ী প্রচণ্ড শক্তির গোলাগুলো যাবে স্থানীয় ডাম্পে (মজুদাগারে) হাল্কা গোলা আর রাইফেলের কার্তুজ ট্রামের সাহায্যে লাইন ধরে চল্‌বে।

শুক্রবারের সন্ধ্যাটিকে আমরা বেছে নিলাম একত্রিত হওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে আমার পরিকল্পনা সফল হলে লোকটির জীবনে আর কোনো শুক্রবারই আসবে না। ৬৩ নম্বরে গোপন লিপি পৌঁছে দিয়ে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম ব্রিটিশ বিমানগুলোর নিক্ষিপ্ত মৃত্যু-বাণ কেমন করে রুসার্সের রেলষ্টেশন ধ্বংস করে দেবে।

পাকশালায় সামরিক পুলিশ আমার জন্য বসে অপেক্ষা করছিল।

আমি সেখানে আসতেই একজন বল্‌লে, ফ্রয়লাইন, বলতে পারেন লুসিল ডেলডন্‌ক নামের স্ত্রীলোকটার কি হয়েছে? অল্প কদিন আগেও তাকে রুলার্সে দেখা গেছে।

আমার বুকের ওপরে প্রকাণ্ড একটা কিছু এসে যেন আঘাত করলো। কিন্তু আমাকে ভাববার অবসর না দিয়েই ফের প্রশ্ন করা হলো, লুসিস ডেলডন্‌ক কোথায় এখন?

আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইলো। ওরা নিশ্চয়ই আমার দ্বৈত কর্মধাবা জানতে পেরেছে। স্নায়ুগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। কিন্তু মোলায়েম গলায় ওরা বলল, ভয় পাবেন না ফ্রয়লাইন। আপনি যা জানেন তাই বলুন।

আমি সাহস সঞ্চয় করে জবাব দিলাম, যে সময় আপনাদের সৈন্য ওয়েষ্ট্‌সবেকের সেলারে হানা দেয়, তখন থেকেই লুসিল নিরুদ্দেশ। আমার অনুমান তাকে জার্মান সৈন্যরা মেরে ফেলেছে। কারণ অধিকাংশ সৈন্যই তখন পানোন্মত্ত আর যথেচ্ছভাবে অস্ত্র ব্যবহার করছিল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনর্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে আপনি ঠিক বলছেন ওঁকে এখানে দেখেন নি? ভালো করে ভেবে দেখুন। কয়েকদিন আগেও কি সে এই ঘরে আসে নি?

এবার আমি ওদের চোখের দিকে সোজা দৃষ্টি রেখেই বলে দিলাম, না। ওয়েষ্ট্‌সবেক ছাড়ার পর থেকে আমি আর ওর দেখা পাই নি।

ওরা চলে যাবার পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম। ওরা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানতে পারে নি। তারপর ভাবতে লাগলাম ৬৩ নম্বরের মারফৎ যে বার্তা প্রেরণ করেছি, রুলার্সে তার ফলাফল কিরূপ হবে। ইংরেজরা কি সমস্ত শহরটাতেই বোমা ফেলবে?

তাহলে তো আমরা সবাই মারা পড়বো। বুধবার রাত্রে জ্বরগ্রস্তের মত শয্যায় কেবলি ছটফট করতে লাগলাম। এক সময় উঠে আলো জ্বাললাম। তিনটে বেজে পনেরো মিনিট। গোলাবারুদের ট্রেন ষ্টেশনে এসে পৌঁছেছে

অকস্মাৎ বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলার কম্পমান অগ্নিরেখায় চিত্রিত হয়ে ওঠে আকাশ। আলোটা নিভিয়ে দিলাম। সাইরেন বেজে ওঠে। শোনা যায় উড়োজাহাজের গুঞ্জন। শয্যা থেকে নেমে আসি, রাত্রিবাসের ওপর একটা কোট জড়িয়ে বাইরে চলে আসি সম্মোহিতের মত। সার্চলাইটের রুপোলী ছুরিগুলো অন্ধকারকে যেন খণ্ড খণ্ড করে কাটতে চাইছে। পড়ন্ত বোমার শাণিত শিসের শব্দ শোনা যায়। তারপরই মাটি কাঁপানো আওয়াজ।

মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শুধু ভাবছিলাম ব্রিটিশরা আমার বার্তা পেয়েছে। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি এই কথা ভেবে যে আজকে এই নিষ্ঠুর মারণযজ্ঞের জন্য একমাত্র দায়ী আমি।

তিনদিন পরে আমাকে যেতে হলো এ্যাডভান্সড ড্রেসিং ষ্টেশনে। রণক্ষেত্রের বেশ কাছাকাছি এসে পড়লাম। ঘাম, রক্ত আর ওষুধের গন্ধে হাসপাতালের হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে এখানে। একটা টেবিলের ওপরে দুটো হ্যারিকেন ল্যাম্প জ্বলছে। এক কোণে ওভারকোটে ঢাকা চারটে মৃতদেহ। আর তার সামনাসামনি বসে তিনজন আর্দালী ঠাট্টা তামাসা জমিয়েছে।

মিত্রপক্ষ সমস্ত রাত ধরে আবার বোমা-বর্ষণ করার সংগে সংগেই আহতদের আসা আরম্ভ হলো। কাদা-রক্ত মাখা ছিন্ন ভিন্ন পোষাকে রাইফেলের ভর দিয়ে আসতে লাগলো অনেকে। ড্রেসিং ও অস্ত্রোপচারের সময় প্রাংগণে বোমা পড়ে টেবিলে শায়িত আহতদের ক্ষতমুখে

কাদা-মাটি ছিটকে এসে পড়ছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওরা মর্ফিয়া চাইছিল।

এখানে অভাব মর্ফিয়ার। তাদের তুষ্টি বিধানের জন্য মর্ফিয়ার লেবেল মারা বোতলে শাদা জল পুরে তাই ইঞ্জেকশন করতে হচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় একটি বেসামরিক ব্যক্তির যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টা করতে গিয়ে চমকে উঠলাম। তার কোটের কলারে দুটো সেফটি-পিন—সেগুলি আড়াআড়ি নয় সোজাসুজি। লোকটিকে দুজন সামরিক পুলিশ নিয়ে এসেছে। খানার মধ্যে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেছে · কে নাকি তার গলা কাটবার চেষ্টা করেছিল।

বাড়ী ফিরে নবাগত লোকটিকে সেকথা জানালাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আক্রান্ত ব্যক্তিটি নিশ্চয় জার্মান ভ্যাম্প্যায়ারদের একজন। নবাগত লোকটির সংগে কথা কইবার সময় আততায়ীর সম্বন্ধে আমার আর কোনো সন্দেহই রইলো না, যখন সে শুধু নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, মারা গেছে লোকটা?

উনিশ শো পনেরো সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে আমার বাবা ক্যারিলন কাফের ভার গ্রহণ করলেন। কাফেটির মালিক রণক্ষেত্রের এত কাছে থাকা পছন্দ না করে সপরিবারে আরো দূরে চলে গেলেন। গোড়া থেকেই সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাফেটি বেশ জমে উঠলো। কাফের কাজের সুবিধা হবে বলে মা দুটো মেয়েকে পরিচারিকা নিযুক্ত করলেন আর আমিও হাসপাতালের কাজের পর কাফের কাজে সহায়তা করতে লাগলুম।

হাসপাতালে অন্যান্য আহতদের মধ্যে ছিল দুটি ব্রিটিশ যুদ্ধ-বন্দী। জিমি আর আর্থার। ভারী আমুদে ছিল লোক দুটি। কারণে অকারণে দেখতাম দুটীতে কখনো তর্কাতর্কি করছে কখনো বা ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। অত্যন্ত সরল দুটি লোক—দেশের কথা বলতো আমায় মাঝে মাঝে। লক্ষ্য করতাম বাড়ীর কথা বলতে গিয়ে লোক দুটি খুশির ভাব হারিয়ে ফেলতো। মিত্রপক্ষীয় বলে আমার সহানুভূতি পুরোমাত্রায়ই ছিল ওদের ওপর। কদিন ধরে তাই আমি ভাবতুম কি করে ওদের জার্মানদের কবল থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। ওদের ক্ষতগুলি প্রায় সেরে এসেছে, আর কয়েকদিন পরেই বন্দী শিবিরে ফিরে যেতে হবে। কিছু করতে হলে এখনি তা করা দরকার।

হাসপাতালের বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে পিয়ের বলে একজন বেলজিয়ান ছিল। গুণ্ডামি আর বজ্জাতি ছাড়া লোকটা লড়াইয়ের আগে কিছুই করতো না। ছোট-খাটো চুরির অপরাধে কবার জেলও খেটেছিল। কথায় কথায় সে একবার মিত্রপক্ষীয় বন্দীদের পলায়নের কথা তুলেছিল। আর্থারও একদিন আমায় জানালো যে পিয়েরের টাকা নেই, তা না হলে তাদের পলায়নে সুবিধা করে দিতে পারতো। পিয়েরকে আমি সাহায্য করবো বলতেই সে সমস্ত ব্যবস্থা করতে রাজী হয়ে গেল।

ড্রেসিং করবার সময় আর্থারকে চুপি চুপি বল্লাম: তোমার ও জিমির জন্য এই হাজার ফ্রাংক রইলো। আজ সন্ধ্যায় বাগানে যখন পায়চারি করবে, তখন সাধারণ কর্মচারীদের ঘরের কাছে একটি বেঁটে মত বেলজিয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বে। পোষাক-পরিচ্ছদ রেডি থাকবে—সেগুলো পরে নিলে সীমান্ত পর্যন্ত পার করে দেবে লোকটা।

ওদের সংগে আর কোনো কথা হয় নি। হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত ছিলান অনেকক্ষণ। দুটো এ্যাম্বুলেন্স কনভয় এসেছে। ছটায় সময় ছুটি হলো। আটটার সময় হাসপাতালের আকস্মিক ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি আমার ওয়ার্ডে এসে ঢুকলাম। দেখতে পেলুম জিমি ও আর্থারের শয্যা খালি। ফিল্ডওয়েবেল* আমাকে ভৎ'সনার স্বরে বল্লেন, ব্যাপাব কিছু জানো নার্স? তোমাব ওয়ার্ডের দুটো রুগী তোমার নাকের সমুখ দিয়েই পালিয়েছে। লজ্জার কথা। কখন তাদের শেষ দেখেছিলে? টাকাকড়ি বা বেসামরিক পোযাক ছিল ওদের?

কিছুই না জানার ভান করলাম আমি। আমার ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমি কিছু দেখিনি। তারপর সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে আমি সাধারণ কর্মচারীদের ঘবে ঢুকলাম। আমার অপেক্ষায় দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল এক ব্যক্তি। আমি তাকে না চিনলেও সে আমার নাম ধরে বল্লে, আমার একটি বন্ধু আপনাকে জানাতে বলেছে যে মাঝরাত্ত নাগাদ হল্যাণ্ডে পৌছে যাবে ওরা।

মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম পিয়েরকে। সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে সে। তারপর বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

বাড়ীতে দুজন আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তাদের দেখেই আমি বলে উঠলাম, কি ব্যাপার? আবার কি হাসপাতালে ডাক পড়েছে?

এদের আমি জানি—আলফন্স ও ষ্টিফ্যান। এখানকারই স্থানীয় লোক। জার্মান বাহিনীতে জোর করে ধরে এনে এ্যাম্বুল্যান্স চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে আলফন্সের ওপর। আর ষ্টিফ্যান নিযুক্ত আছে ব্রিগেড অর্ডারলি রুমের কেরাণীর চাকরীতে। এদের আকস্মিক আগমনের

---

* ব্রিটিশ আর্মিতে সার্জেণ্ট।

কারণ কি হতে পারে ? এরা জার্মানদের এজেন্ট ? জিমি আর আর্থারের পলায়নের ব্যাপারে কিছু কি সন্দেহ করেছে এরা ?

ষ্টিফ্যান বল্লে, গাড়ীর ইঞ্জিন মেরামত করতে গিয়ে আলফন্স আঙুল কেটে ফেলেছে। গুরুতর কিছু নয়, তবে যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে—

ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি, বসো তোমরা, বলে উপরে চলে এলাম। সন্দেহ তখনো রয়েছে। কতক্ষণ এরা এখানে রয়েছে। ড্রেসিং-এর দরকার হলে ষ্টিফ্যানই তো তা করে দিতে পারতো। ওরা কি আমার দ্বিমুখী কাজ জানতে পেরেছে ? এই সব ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আমি আমার ব্যাণ্ডেজের ছোট বাক্সটি নিয়ে নীচে নেমে এলাম।

আলফন্সের আঙুলে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দেবার সময় সে জিজ্ঞাসা করলো হঠাৎ, নার্স, আপনার এই ডবল কাজ কি রকম লাগছে ?

প্রশ্নটি আমাকে মৃত্যুর মত পাণ্ডুর করে দিল। ডবল কাজ বলতে কি বুঝাতে চাইছে ও ? আমি কিছু জবাব দিতে পারলুম না। যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করে কাজ করে যেতে লাগলাম।

ব্যাণ্ডেজ আঁটার জন্য পিন দরকার নয় ? সে বল্ল আবার, আমার সেফটি-পিন আছে।

আমি বললাম, একটা ছোট পিন দরকার।

সে তার কোটের কলারটা তুলে দেখালো। দুটি সেফটি-পিন আড়াআড়ি ভাবে বসানো রয়েছে। আমার বুক থেকে বিরাট একটা বোঝা যেন নেমে গেল। হেসে আমিও আমার পোষাকের কলারটা উল্টে দেখালাম। ষ্টিফ্যানও তার কলার দেখালো।

ষ্টিফ্যান বল্ল, তাহলে আমাদের সবারই সেফটি-পিন রয়েছে। আমরা সবাই এক সংগে বেলজিয়মের সেবা করছি।

আমার কথা তোমরা জানলে কি করে ? জিজ্ঞাসা করলাম।

ক্যান্টিনের সার্জেণ্ট মেজর আপনার সংগে দেখা করবার জন্য বলেছিল।

কে? বিস্মিত হয়ে আমি বলি, সেই জার্মান—

বাধা দিয়ে আলফন্স বলে, সে জার্মান নয়। ইংল্যাণ্ডের স্যাণ্ডহার্ষ্টের মিলিটারী কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত সে। লড়াইয়ের আগে ওকে জার্মানীতে পাঠানো হয়। কাল পর্যন্ত সে আমাদের যোগসূত্ররক্ষী ছিল, কিন্তু ওকে অন্যত্র কোথাও স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ষ্টিফ্যান ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টার থেকে আর আমি লাইন থেকে যেসব টুকরো খবর পেতাম, এতদিন ওকে দিতাম। চলে যাওয়ার আগে তাই ও আমাদের যা কিছু বার্তা 'লরা'র হাতে দিতে বলেছিল। 'লরা' কে জানার পর এখানে না আসা ছাড়া আমাদের আর উপায় কি?

আমি কোনো সংবাদ আছে কিনা জানতে চাইলাম।

ষ্টিফ্যান বল্লে, এই কাফেতে অটো ফন প্রম্‌ট্ বলে যে ছোকরা অফিসারটা এসে আস্তানা গেড়েছে কেমন মনে হয় তাকে?

যুদ্ধের আগে ছেলেটি ছিল ছাত্র এইটুকু জেনেছিলাম তার মুখ থেকে। কথাবার্তা তার বেশ মার্জিত। ব্যবহারও ভালো। সন্দেহ করবার মত কিছু পাইনি ওর মধ্যে। তাই ষ্টিফ্যান যখন জানালো অটো হচ্ছে জার্মান পুলিশের চর আর মিত্রপক্ষের গুপ্তচরদের ফাঁদে ফেলার জন্যই তার এখানে আগমন তখন বিস্মিত ও আশংকিত বোধ করলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম ওকে, তুমি জানলে কি করে? তাহলে তো আমাকেও সন্দেহ করেছে।

তানয়, ষ্টিফ্যান বল্ল, জার্মানরা কোনো বেলজিয়ানকেই বিশ্বাস করে না। আপনি একটু সতর্ক থাকবেন।

ষ্টিফ্যানের কাছ থেকে জানতে পারলাম অনেক কথা। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্সে সেন্সর অফিসার বিশেষ ব্যস্ত থাকলে ষ্টিফ্যান খাম থেকে চিঠিপত্র বার করে অফিসারের সামনে রাখে, তারপর দেখা হয়ে গেলে ফের ভর্তি করে দেয় খামে। সেন্সর অফিসারেব অনেক সময় আসতে দেরী হয়ে যায়, লাঞ্চের সময়ও বিলম্ব ঘটে। সেই সময়ই ষ্টিফ্যানের পক্ষে খাম থেকে চিঠি বার করে পড়ে নেবার সুবিধা হয়। আলাদা বস্তায় অফিসারদের যেসব চিঠিপত্র আসে, জ্ঞাতব্য মালমশলা সেগুলোতেই থাকে বেশী। তাই ষ্টিফ্যান সেগুলোর দিকে আগে দৃষ্টি দেয়। অফিসারদের চিঠির বস্তা থেকে ষ্টিফ্যান একদিন কে এক অটো ফন প্রম্‌টের তার মায়ের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি দেখতে পায়। সেটা পড়ে সে বুঝতে পারে লোকটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রুলার্সে এসেছে, কাজটা যেমন সহজ তেমনি আকর্ষনীয় বটে। ষ্টিফ্যান এই লোকটীর সন্ধান করতে করতে অবশেষে তাকে এই কাফেতেই আবিষ্কার করেছে। লোকটির সকলের সংগেই দিলখোলা ব্যবহার আর খুব মেশামেশি দেখে আর সামরিক বা পুলিশবিভাগীয় কোনো কাজই তার না থাকায় ষ্টিফ্যানের অনুমান লোকটি বিপজ্জনক।

ওরা আমাকে আরেকটি খবর দিল। রুলার্সে শেষ যে ট্রেনটি এসেছিল, তাতে অনেকগুলি লম্বা ধাতুনির্মিত সিলিণ্ডার এসেছে। কি আছে ওতে আর কি উদ্দেশ্যে এসেছে তা ওরা জানতে পারেনি। আমাকে এ-সম্বন্ধে খবর নিতে বল্ল।

আমাদের কাফেতে অটো ছাড়া আরো দুজন জার্মান অফিসার ছিল। হাসপাতালের ডিউটির পর বাড়ীতে এসে যখন বিশ্রাম করতাম, তখন দেখা হলে ওরা আমার সংগে গল্প করতো, কখনো কখনো বা ডিনারের আমন্ত্রণ জানাতো। কদিন ধরে লক্ষ্য করছি ওরা কেমন উৎফুল্ল

হয়ে উঠেছে। আলোচনার সময় কেবলি ওরা জার্মানদের আশু জয়লাভের সম্ভাবনার কথা বলে। ক্যান্টিন-মাও একদিন আমার সংগে দেখা করে জার্মান সৈন্যদের মনে দ্রুত জয়লাভের বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে কারণ অনুসন্ধানের অনুরোধ জানালো।

এক সময় মা বল্ল, আমি দেখেছি ওরা কি সব আঁকজোঁক করে। কথাবার্তা যেটুকু শুনেছি তাতে মনে হয় হাওয়ার গতি আকাশের অবস্থা এই সবই পর্যবেক্ষণ করে।

আমিও জানতে পারলাম ওদের মধ্যে একজন, রাইখম্যান, উড়ো-জাহাজে উঠে হাওয়ার গতি নিরূপণ করে লিপিবদ্ধ করে রাখছে। একদিন অটো কার্ল ও রাইখম্যান কাফে থেকে বেরিয়ে গেলে আমি রাইখম্যানের ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ওর আবহাওয়া চার্ট ও গ্রাফগুলো দেখতে পেলুম। ইতিমধ্যে আলফন্স জানিয়ে দিয়েছিল সিলিণ্ডারগুলি রাইখম্যানের তত্ত্বাবধানে এসেছে। কিন্তু ওর ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শুধু আবহাওয়ার রিপোর্ট ছাড়া সিলিণ্ডার সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারলাম না।

৬৩ নম্বরকে এই ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম। ক্যান্টিন-মার মারফৎ জবাব পেলাম, আবহাওয়ার রিপোর্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে সৈন্য-চলাচল ট্রেনের আসা-যাওয়ার সময়, ইত্যাদি ঢের বেশী মূল্যবান।

প্যারীর আসন্ন পতন সম্ভাবনায় দিনে দিনে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল জার্মান সৈনিকরা। আকস্মিক দ্রুত বিজয়লাভের গুজব পথে-ঘাটে প্রচারিত হচ্ছিল জার্মান সৈন্যদের দ্বারা। এপ্রিলের গোড়ার দিকে একদিন সকালে হাসপাতালে যেতেই ওবেরাৎস (প্রধান কর্তা) জানালেন, হুকুম এসেছে এদিককার সমস্ত হাসপাতাল থেকে অবিলম্বে

আহতদের সরিয়ে দিতে হবে। কৌতূহল প্রকাশ করতে সাহস করলুম না, শুধু বুঝলাম রণক্ষেত্রের কাছাকাছি হাসপাতালগুলি থেকে রুগীদের স্থানান্তর করার অর্থ হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর আরো অগ্রগতি। খবরটা মূল্যবান। সেই রাত্রে ৬৩ নম্বরকে গোপন-বার্তা পৌছে দিলাম; তারপর আরো সৈন্য আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

কিন্তু অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রইলো। নূতন সৈন্য এলো না। সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে রইলাম। তবু মনকে সান্ত্বনা দিলাম আমার যথাসাধ্য করেছি। প্রতিটী সম্ভাব্য যুক্তি ও কারণ বিচার করে লিপিবদ্ধ করেছি।

অবশেষে সমাধান-সূত্র খুজে পাওয়া গেল। আমার বেশ মনে আছে ২২শে এপ্রিল ১৯১৫ দিনটি ছিল চমৎকার। মৃদু বসন্তের বাতাসে ছিল গ্রীষ্মের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু রণক্ষেত্রের দিক থেকে বয়েছিল এক শয়তানের বাতাস। সেটা নো-ম্যান্‌স ল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে উড়ে মিত্র-পক্ষের পরিখাগুলির মধ্যে ঢুকে ছড়িয়ে দিয়েছিল মৃত্যুর আস্তরণ।

২৩ তারিখের সকালে হাসপাতালের জরুরী ডাক পেয়ে ছুটে গেলাম সেখানে। ইতিপূর্বেই সেখানে এ্যাম্বুল্যান্স বোঝাই হয়ে হতভাগ্য বন্দীর দল আসতে শুরু করেছে। প্রথমে দশবিশজন করে, বেলা বাড়ার সংগে শতকে শতকে। মুমূর্ষু মানুষ—রুদ্ধশ্বাস, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, একটু হাওয়া ও অক্সিজেনের জন্য সংগ্রামশীল। হাসপাতাল ভরে উঠলো ফরাসী সৈন্যের ভিড়ে। মাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে মরে যাচ্ছে মানুষ। যন্ত্রণার আক্ষেপে পোষাক ছিন্নভিন্ন। মুখগুলি বিভৎসভাবে বিবর্ণ ও নীল। কটু গন্ধে লিপ্ত সর্বাংগ।

হাসপাতালে ওদের সকলের স্থান হবার মত জায়গা আর রইলো না। এ্যাম্বুল্যান্স থেকে ষ্ট্রেচারের সাহায্যে পথের ওপরই নামিয়ে নেওয়া হতে লাগলো ওদের। আহত বন্দীদের চতুষ্পার্শে জনসাধারণের ভিড়

বাড়তে দেখে জার্মান প্রহরীরা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে হটিয়ে দিতে লাগলো। ক্রমশ জনতাই প্রহরীদের একপাশে ঠেলে দিল। হঠাৎ কে যেন চীৎকার করে উঠলো ঃ ভিভ্ লা ফ্রাঁস! ফ্রান্স জিন্দাবাদ! জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো আকাশবাতাস। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল অশ্বারোহী জার্মান সৈন্যদের। জনতাকে অল্প আয়াসেই ছত্রভংগ করে দিল ওরা।

আবহাওয়ার রিপোর্ট আর সিলিণ্ডারের রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। ঐতিহাসিকরাই বলতে পারবেন জার্মানরা এর ফলে বিজয়লাভের কতটা নিকটবর্তী হয়েছিল, কিন্তু ইতিহাস তাদের কখনো ভুলবে না যারা প্রথম গ্যাস-আক্রমণের শিকার হয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছিল।

হাসপাতালের কাজ অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়ে আসায় আমার অবকাশ-সময় দীর্ঘ হয়ে উঠতো। সেদিন যখন ফিরে এলাম, ঘড়িতে দেখলাম মোটে সাড়ে চারটে। আকাশ বিষন্ন হয়ে উঠেছে, প্রায়-নির্জন পথের ধূলির সংগে খেলা করছিল শীতের হাওয়া। আমাদের কাফের নীচের তলার সামনের ঘরটিতে কয়েকজন বেলজিয়ান ছাড়া কোনো জার্মান ছিল না।

আমার প্রথম পরিচিত সেই নবাগত ভদ্রলোকটী (সেপটিপিনম্যান) আমার মায়ের সংগে কথা বলছিল কাউণ্টারে হেলান দিয়ে। এই কাফের ভার গ্রহণ করার পর কয়েকবার তার সংগে পথে আমার দেখা হয়েছিল। লোকটী মধ্যে মধ্যে আমাদের এখানে আসতো আর জার্মান লোকগুলোর সংগে বেশ অন্তরংগভাবে গল্প করতো। শাদা-পোষাকপরা জার্মান এজেণ্টদের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার কত গল্প আমার

কানে আসতো। শুনে ভাবতাম এরই কীর্তি। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের কোনো আলোচনা হয় নি, আর আমি জানতেও চাই নি।

একটু পরেই আমাদের কাফেতে এলো দুজন জার্মান মিলিটারী পুলিশ আমাদের রোজকার খরিদ্দার। ঘরের মধ্যস্থলে বসেছিল একজন বেলজিয়ান। শহরে এর আগে দেখে থাকলেও আমার পরিচয় না তার সংগে। দেখলুম মিলিটারী পুলিশের লেফ্‌টেন্যাণ্টটীর দৃষ্টি তার দিকে পড়ে একেবারে স্থির হয়ে রইলো। লোকটি তা লক্ষ্য করে নি। একটু পরেই অফিসারটীকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনলুম: তুমি তো ক্লার্সের লোক নও, তোমার পাশপোর্ট দেখতে চাই আমি।

লোকটা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পকেট থেকে পাশপোর্ট বার করলে। লেফটেন্যাণ্ট সেটা ভালো করে পরীক্ষা করলো। বেশ বোঝা গেল সেটী নির্ভুল হওয়ার জন্য চটে গেছে, তারপর ফেরৎ দিল। লোকটী পকেটে রেখে দিলে সেটা। হঠাৎ মিলিটারী পুলিশটী লোকটার জামার কলার আচমকা উল্টে দিতেই দেখা গেল দুটো সেফটি-পিন আড়াআড়ি ভাবে সেখানে লাগানো রয়েছে।

তোমাকে আমার সংগে আসতে হবে, বলে অফিসারটী লোকটাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেতে লাগলো। আমার পরিচিত লোকটী এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবার সে জার্মানটীর কাছে গিয়ে বল্ল: আপনার সংগে একটা কথা বলতে চাই হের—

জার্মানটা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি চাও তুমি?

আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল লোকটী। হঠাৎ তার ডান হাতটী ওপরের দিকে উঠলো। শুনতে পেলাম বেলজিয়ানটীকে সে বলছে: রাওল, খিড়কির দরজা দিয়ে সীমান্তের দিকে—

নবাগত লোকটী তারপর একটু সরে গেল, জার্মানটী দাঁড়িয়েছিল মৃত্যু পাংশু মুখে, টেবিলের কানায় রাখা আঙুলগুলি তার থর থর করে কাঁপছিল। একটা ছুরি তার বাঁ দিকের পাঁজরে আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। হঠাৎ সর্বশরীর তার কেঁপে উঠলো, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে গেল, তারপর সে দলা পাকিয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। বিদ্যুৎ ঝলকের মত রাওল তার কবলমুক্ত হবার পরই পাকশালার মধ্য দিয়ে অন্তর্হিত হলো। অন্য জার্মান পুলিশটী মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপরই সে এগিয়ে এলো গালি দিতে দিতে। আমার পরিচিত লোকটী সরে গেলো তার আক্রমণ এড়াবার উদ্দেশ্যে, টেবিলের ওপর থেকে একটা বোতল নিয়ে সজোরে সে পুলিশটার মাথায় আঘাত করতেই পুলিশটা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে গেল। বোতলটী তারপর টেবিলে নামিয়ে রাখলো সে, রাওলের না-খাওয়া গ্লাসের মদ অর্ধেক পান করলো, তারপর একটীও কথা না বলে আমাদের কাফে থেকে বেরিয়ে এলো। রুলাসে´ আর কোনোদিন তার দেখা পাই নি।

প্রকাশ্য দিবালোকে জার্মান পুলিশ হত্যার ব্যাপারটা হয়তো অনেক দূর গড়াতো, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তদন্ত শুরু হলে প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই একবাক্যে এজাহার দিলে যে ব্যাপারটী একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। আর হত্যাকারী লোকটা সকলকে রিভলবার দেখিয়ে নিরস্ত রেখেছিল। দ্বিতীয় পুলিশটী সে সময় অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল বলে প্রতিবাদ করতে পারে নি সে, তাই আমাদের এজাহার সত্য বলেই গৃহীত হয়েছিল।

মে মাসের গোড়ার দিকে একটী সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ বিমান বহর রুলাসে´ ভয়াবহ বোমাবর্ষণ করতে লাগলো। কখনো কখনো বা

বিমানগুলি খুব নীচুতে নেমে এসে দৃষ্টিগোচর সব কিছুর ওপর মেসিন গানের গুলি চালাতো। এই ব্যাপারে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা হয়েছিল যে জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো উপায়ে ক্রমাগত সংবাদ শত্রুর কাছে পৌঁছচ্ছে। কিন্তু গুপ্তচরদের ধরা সম্ভবপর না হওয়ায় অবশেষে ফ্রণ্টের কাছাকাছি জায়গাগুলি থেকে বেসামরিক জনসাধারণের স্থানত্যাগ করার হুকুম ঘোষিত হলো।

ষ্ট্যাডেন থেকেও বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হলো। আমার এক কাকাকে সেখানকার বাস তুলে ক্রুগের নিকটবর্তী রাদারবুর্দ গ্রামের গোলাবাড়ীতে চলে আসতে হয়েছিল।

ক্যান্টিন-মার মারফৎ একদিন আমার কাছে অনুরোধ এলো ক্রুগ উপকূল ও সংলগ্ন জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর পাঠাবার জন্য। কিন্তু জায়গাটা জার্মান নৌ-বিভাগীয় সৈন্যদের সদজাগ্রত প্রহরায় এমনভাবে সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য যে তথ্য সংগ্রহ আপাতত অসম্ভব মনে হতে লাগলো। আমার কাছে আরেকটা বার্তা এসেছিল: জার্মানদের কাছে মিত্রপক্ষের মূল্যবান সংবাদ ক্রমাগত প্রেরিত হচ্ছে। জার্মান বন্দীদের কাছ থেকে যেটুকু সংবাদ জানা গেছে তাতে বোঝা যায় ব্রিটিশ লাইনের পিছনেই কোথাও কোনো একটা গুপ্ত টেলিফোন লাইনের পয়েণ্ট আছে, যার অন্য পয়েণ্ট ক্রুগ জেলার রাদারবুর্দের আশেপাশের অরণ্য-অঞ্চলে কোথাও রয়েছে। ব্রিটিশ লাইনের অভ্যন্তরে এই টেলিফোন লাইনের অবস্থান ও অপারেটরের পরিচয় অবিলম্বে প্রয়োজন।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্যাস-আক্রমণের পর আমাদের কাফের তিনটী জার্মান বাসিন্দার মধ্যে অটো ছাড়া আর দুজন চলে গিয়েছিল। অটো আগের মতই ছিল। ওদের জায়গায় আর একজন এসে হাজির হয়েছিল। লোকটার নাম ফাস্নগেল। কোন্ এক মেসিন- গান কোম্পানীর

কম্যাণ্ডার। আমার সংগে সে খুব ভালো ব্যবহারই করতো: এক সময় কাফেতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রুলাস´ থেকে আমাদেরও কি সরে যেতে হবে ?

সে মন্তব্য করলো, যাওয়াই তো ভালো। এই বিশ্রী জায়গায় কি পাওয়া যায় ? যদি যেতে হয় তো কোথায় যাবে ?

বল্লাম, রাদারবুর্দে আমাব এক কাকা আছে, সেখানে গিয়েই আমরা উঠবো। আমাদের বেসামরিক জনসাধারণের কাছে হুকুম আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব জিনিষপত্র নিয়ে চলে যাওয়া যে কি কষ্টকর বোঝানো যায় না। অর্ধেক জিনিষই আমাদের ফেলে যেতে হয় উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে।

ফাস্নুগেল একটু চিন্তা করে বল্লে, তাইতো মার্থা, একজন জার্মান ড্রাইভারের পক্ষে বেলজিয়ানের খোঁজ-খবর করাটা সন্দেহ-জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, এই সব ক্ষেত্রে আমাদের. ওয়াগন ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ' বিশেষ করে জানাজানি হলে আমার পক্ষেই মুস্কিল—

আমিই যদি ড্রাইভারের সংগে যাই ?

তোমার জন্য একটা পাশ জোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না। কিন্তু তোমাকে জার্মান সৈন্যের উর্দি পরে যেতে হবে।

আমি রাজী হয়ে যেতেই পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের কাফের সামনে একটী ওয়াগন এসে দাঁড়ালো। হাসপাতাল থেকে আমি আমাদের জিনিষপত্র অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি নিয়েছিলাম। ড্রাইভার ভেতরে এসে আমার হাতে জার্মান সৈন্যের পোষাক দিলে। আমি সেগুলো পরিধান করে নিলাম। জামাটা আঁট হলেও জুতাটা ঠিক ছিল। আর টুপিটা বড় থাকায় চুলগুলো ঢেকে নেবার সুবিধাই হলো। জিনিষপত্র আগের দিন রাত্রে সব বাঁধাছাঁদা

করে নিয়েছিলাম। সেগুলি ওয়াগনে তুলে দিয়ে জার্মান সৈনিকের ছদ্মবেশে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম।

তমসাবৃত পথে বাইসিকেল-আরোহী জার্মান পুলিশ ছুটোছুটি করে যাচ্ছিল। আমার ড্রাইভার আমার হাতে একটী চুরোট গুঁজে দিল। গন্ধটা বিশ্রী বলে অল্প ধূমপান করাব পর সেটী ফেলে দিলাম। ছোট ছোট গ্রামগুলি পেরিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। প্রত্যেক গ্রামেই জার্মান প্রহরীরা আমাদের গাড়ী থামিয়ে প্রশ্ন করছিল। আমার ড্রাইভার '৫২তম মেশিনগান কোম্পানী' বলামাত্রই তারা গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছিল। জার্মান সেনাবাহিনীতে প্রত্যেকটী মেশিনগান কোম্পানীর যান-বাহন ব্যবস্থার 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট থাকার জন্য কোম্পানী-কম্যাণ্ডাররা নিজের দায়িত্বে বহুদূর পর্যন্ত যান-বাহন নিয়ে যেতে পারতো।

সকালবেলা আমার কাকার গোলাবাড়ীতে এসে পৌছলাম। আমাকে চিনতে পেরে কাকা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আমাকে ও আমার সংগীটীকে কাকা প্রচুর পরিমাণে খেতে দিলেন। জার্মান ড্রাইভারটী নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগলো। তারপর উঠে শুতে গেল, বল্লে, আমার যখন দরকার হবে, তখনি সে নিয়ে যাবে আমাকে। আমি জানালাম সারাটা দিন আমি এখানে থাকবো।

কাকা ও তাঁর দুই ছেলের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ আহরণ করতে হবে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে এই অঞ্চল সম্পর্কে মূল্যবান কতকগুলি জ্ঞাতব্য জেনে নিলাম। টেলিফোন লাইনের ব্যাপারটারও একটা আভাস পাওয়া গেল—পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার মনস্থ করলাম।

কৃষক হিসাবে আমার কাকাকে তাঁর উৎপন্ন দ্রব্যের কতকাংশ সামরিক কর্তৃপক্ষকে দিতে হতো। ডকের দুই কিলোমিটারের মধ্যে অনুমোদিত

ব্যক্তিরা ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। ডুবোজাহাজের আশ্রয় দেবার জন্য একটা বিরাট ডক থাকায় ওই নিয়মটা। কাকা কয়েকবার তার জিনিষপত্র সেখানে নিয়ে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন। তাই ডকের মোটামুটি একটা নক্সা এঁকে দিতে পাবলেন।

কামান আর সৈন্য এনে এখানকার নৌবাহিনীকে নূতন ভাবে শক্তিশালী করা হচ্ছে জানতে পারলুম। ভাসমান সেতু নির্মানের বহু উপাদান আনা হয়েছে ওখানে। কদিন আগে নাকি গোড়ালী ভাঙা জুতোপরা আধপেটা-খাওয়া রুশবন্দীদের দ্বারা ভারী ভারী কামান ধূলিধূসর উঁচু-নিচু পথের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমার কাকা আরো জানালেন তিন মাইল দূরে একজায়গায় একটা কাঠের কেবিন আছে, দূর থেকে মনে হবে যেন দুটো লম্বা গাছের মধ্যে বসানো আছে সেটা। সেই ঘরটার গায়ে জার্মান সমর বিভাগের মোহর রয়েছে। গত বছর থেকে ঘরটা রয়েছে সেখানে দুটো সৈন্য থাকে ওর মধ্যে। লোকেরা ওদের নাম দিয়েছে বুড়ো আর বুড়ি। একা একা ওরা কি যে করে ওখানে সেটা স্থানীয় লোকদের কাছে মস্ত বিস্ময়। মজার কথা হচ্ছে যখন খটখটে রোদ থাকে, তখন 'বুড়িটা' বাইরে বেরোয়। আর যখনই বৃষ্টির প্রতীক্ষায় আকাশ কালো হয়ে ওঠে, তখন বাইরে বেরিয়ে আসে 'বুড়ো'টা।

আমি সেই কাঠের কেবিনে গিয়ে সব কিছু দেখে আসার মনস্থ করলাম। কাকা শুনে প্রথমটা বাধা দিলেন, কিন্তু আমার অত্যুগ্র আগ্রহ দেখে শেষে অনিচ্ছার সংগেই সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। আমার নারীত্ব সম্পূর্ণ গোপন করার জন্য আহত সৈনিকের ছদ্মবেশ ধারণ করলুম। কপাল মাথা ও একটী চোখ ব্যাণ্ডেজে ঢেকে দিলাম। তারপর একটা

লাঠির সাহায্যে অতি কষ্টে চলার ভান করে বেরিয়ে পড়লাম গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে।

কেবিনের কাছাকাছি ঘনবৃক্ষরাজির মধ্যে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাবছিলাম কি করা যায়। একটু পরেই দেখলাম কেবিনের দরজা খুলে একটী লোক বেরিয়ে এসে রাদারবুর্ডের দিকে পা বাড়ালো। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, মেঘ জমে উঠেছে, বৃষ্টি হবে এ লোকটী নিশ্চয় সেই বুড়োটা। কেবিনে এখন একা 'বুড়ি' আছে।

নিঃশব্দে ভিতরে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো লোকটি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি চাই আমি? আমি আমার চোয়ালের ব্যাণ্ডেজ দেখিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম কথা কইবার শক্তি নেই। ঠোঁটের ফাঁকে পাইপ ধরা ছিল আমার। সেটা নিভে গিয়েছিল। আমি একটু তামাক চাইলাম ইংগিতে। সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠলো জার্মানটা। তামাক দিয়ে আমার জন্য চায়ের জল চড়িয়ে দিল। একটু-খানি সময়ের মধ্যেই আমরা অনেকখানি বন্ধু হয়ে উঠলাম।

কাগজে লিখে একসময় জিজ্ঞাসা করলাম, একা বনের মধ্যে কি করো কমরেড?

টেবিলের ওপর বসানো ছিল ফিল্ড টেলিফোন। সেটার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে সে জবাব দিল, হান্‌স ও আমাকে এইখানে খুব মূল্যবান কাজ করতে হয়। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু কমরেডদের এখানে আসা আমরা পছন্দ করি না।

আমি বলি, ট্রেঞ্চে ইঁদুরের সংগে খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়ার জীবনের তুলনায় তোমরা এখানে বেশ আছো।

ট্রেঞ্চে আমাদেরও থাকতে হয়েছিল, কিন্তু আমি আর হান্‌স খুব বুদ্ধিমান বলেই তো এ কাজের ভার আমাদের ওপরই দেওয়া হলো। তুমি

কিছুতেই জানতে পারবে না শত্রুর লাইনের পিছনে আমাদের ওদিক-কার পয়েণ্টে কে আছে।

আমি বল্লাম, নিশ্চয় কোনো বড় অফিসার!

ফুঃ! অবজ্ঞাভরে বল্লে জার্মানটী, শুনলে অবাক হবে কমরেড ওদিকে আমাদের সংযোগ রক্ষা করছে একজন তথাকথিত পাদ্রী।

লোকটীর প্রগল্‌ভ নির্বুদ্ধিতায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম মনে মনে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, পাদ্রীটি কি রোজই খবর দেয়? তাহলে সর্বক্ষণই তোমাদের টেলিফোনের কাছে থাকতে হয়।

হ্যাঁ, তা হয় বই কি, এই তো হান্‌স ফিরবে সেই রাত নটায়, ততক্ষণ আমাকে টেলিফোন নিয়ে থাকতে হবে।

চায়েব জল তৈরী হয়ে গেছে। লোকটা পিছু ফিরে চা তৈরী করতে লাগলো। আমি সুযোগ বুঝে আমার লাঠি দিয়ে সজোরে ওর মাথায় আঘাত করতেই সে পড়ে গেল। প্রয়োজন হতে পারে ভেবে হাসপাতাল থেকে কাউকে না বলে এক শিশি ক্লোরোফর্ম সংগে নিয়ে বেথে ছিলাম। ক্ষিপ্রহস্তে রুমালে ঢেলে নিয়ে আচমকা তার নাকে চেপে ধরতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এখন আমার করণীয় হচ্ছে ব্রিটিশ লাইনের ওপারে টেলিফোন পয়েণ্টের লোকটিকে জানা। আমি আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করতে লাগলাম 'কলের' জন্য। প্রার্থনা করতে লাগলাম এখনি যেন টেলিফোন বেজে ওঠে। কতক্ষণ কেটে গেল জানি না, একসময় টেলিফোন-কল এলো।

যথাসাধ্য সম্ভব আস্তে আস্তে বল্লাম কি খবর আছে?

অপর প্রান্ত থেকে পাল্টা প্রশ্ন হলো: কে তুমি? তোমার স্বরটা অচেনা লাগছে।

জার্মান ভাষায় কথা বলছে ওদিককার লোকটা। মনে হলো যেন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর!

আমি উত্তর দিলুম, আমি একজন অফিসার কথা বলছি। ভয়ানক দুঃসংবাদ জানাচ্ছি। ব্রিটিশ বিমান এখানে আগুনে বোমা ফেলে চতুর্দিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অপারেটর দুজনই মারা গেছে। তোমার রিপোর্টটা দিয়ে ফেল আগে।

তার রিপোর্টে আমার কোনো কাজ ছিল না। তাই আমি তা নিয়ে মাথা ঘামালুম না। আমি তাকে বল্লুন, ব্রিটিশরা আমাদের এই টেলিফোন-পয়েণ্টের খবর পেয়ে গেছে কোনোক্রমে। আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে বোধ হয় গ্রেপ্তার করেছে। সেটা এখনো না হলেও খুব নিশ্চিত যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তোমার পক্ষে একটা কিছু বিপজ্জনক ঘটতে পারে। তুমি আমাদের পক্ষে খুবই মূল্যবান, তাই তোমার উচিত হবে সরে যাওয়া।

একটু ভেবে নিয়ে জানালুম, চার দিনের মধ্যে ব্রিটিশ লাইনের পিছনে আমাদের এরোপ্লেন থেকে একটা লোককে প্যারাশুটে নামিয়ে দেওয়া হবে। সে তোমাকে জানাবে কি করতে হবে। তোমার কাছে ম্যাপ আছে তো? তাহলে এমন একটা নির্জন স্থানের উল্লেখ করো, যেখানে আমাদের চরটা নির্বিঘ্নে অবতরণ করতে পারে। সেখানে তুমি তার সংগে দেখা করবে।

তার কাছ থেকে স্থানীয় বিশদ বিবরণ পাওয়া মাত্রই আমি টুকে নিলাম। তারপর টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। পাশে ফিরে তাকালাম। লোকটা তখনো সংজ্ঞাহীন হয়ে রয়েছে। তারপর কেবিন থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক সময় ফিরে এলাম কাকার কাছে। ব্যাণ্ডেজ ও ছদ্মবেশগুলো সরিয়ে ফেল্লাম। তারপর আহারাদি সেরে

৫২তম মেশিন-গান কোম্পানীর ওয়াগনে চড়ে রুলার্সে প্রত্যাবর্তন করলাম।

আর পরের দিনে রাত্রেই সমস্ত ব্যাপারটা লিপিবদ্ধ করে পৌঁছে দিলাম ৬৩ নম্বরকে।

এই ঘটনার একসপ্তাহ পরে সকালে হাসপাতালে উপস্থিত হওয়া মাত্র একজন ড্রেসার আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওবার্স্টজের কক্ষে। সেখানে গিয়ে দেখি টাউন-মেজরও বসে রয়েছেন। ওবার্স্টজ কখনো তাঁর কক্ষে আমাকে ডেকে পাঠান নি। তবে কি আমার সেই দুঃসাহসিক অভিযান প্রকাশ পেয়ে গেছে? আশংকায় আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলো।

হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার করমর্দন করলেন, তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছি ফ্রয়লাইন।

বুঝতে পারলাম না এটা পরিহাস-না অন্য কিছু।

ওবার্স্টজ বল্লেন, হিজ রয়াল হাইনেস কিং অব হুর্টেমবুর্গ জানাচ্ছেন যে হাসপাতালে চমৎকার কাজ করার দরুন তোমাকে আয়রন ক্রশ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হেসে উঠতে চাইলাম আমি। চেয়ারটায় বসে পড়লাম ধপ্ করে। ওবার্স্টজ আমার দিকে পানীয়ের গেলাস এগিয়ে দিলেন। সেই দিনেই ক্যান্টিন মার কাছ থেকে বার্তা পেলাম: অনেক ধন্যবাদ। ডুবোজাহাজের ঘাটির খবরটা মূল্যবান।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আলফন্স বল্লে, হাসপাতালের কাছেই মাটিতে একজায়গায় বোমা পড়ে গর্ত হয়ে যায়। সেই গর্তটাকে দেখতে গিয়ে সে নাকি একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেছে। সেই গর্তটার সংগে নাকি যোগ রয়েছে রুলার্সের বহু প্রাচীন পয়ঃ-প্রণালীর, যেটা

ভূগর্ভের মধ্যে দিয়ে বহু দূর চলে গিয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে জার্মানদের প্রধান 'ডাম্প' (অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ রসদ মজুদখানা) যেখানে, তার নীচ দিয়েই চলে গেছে ঐ পয়ঃপ্রণালীটা।

আলফন্সের প্রস্তাব প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে সেটা হৃদয়ংগম করে চমৎকৃত হয়েছিলাম। তার কথা হচ্ছে ওই পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়ে জ্যামিতিক হিসাব অনুযায়ী অগ্রসর হলে আমরা ইচ্ছা করলেই জার্মানদের প্রধান ডাম্পটা ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দিতে পারি। এই উদ্দেশ্যে সে নাকি ইতিমধ্যে একটা ম্যাপও প্রস্তুত করে ফেলেছে।

নির্দিষ্ট দিনে গভীর রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমি ও আলফন্স গাঁইতি ও ডিনামাইটের বাক্স নিয়ে গর্তে নামলাম। ওর সঠিক হিসাব অনুযায়ী আমরা ঠিক ডাম্পের নীচে এসে পৌছলাম। তারপর কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর মৃত্তিকাস্তর ভেদ করে আলফন্সের সাহায্যে আমি ডাম্পের পিছনদিকে উঠে পড়লাম। পেট্রলের টিন সাজানো রয়েছে এখানে। আমি একটা ডিনামাইটের ফিউজ স্থাপন করে দিলাম। অন্ধকার পৃথিবী। এ দিকটার কোনো প্রহরী নেই। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাইফেলের টোটাভর্তি বাক্সগুলোর স্তূপের মধ্যে আরেকটা ডিনামাইটের সংযোগসাধন করে দিলাম। দেশলাই জেলে ফিউজগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে তাড়া-তাড়ি নেমে এলাম সুড়ংগে তারপর আলফন্সের সংগে ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এসে বাড়ীতে পৌছলাম।

মার কাছে শুনলাম সাড়ে দশটার পর দুটো বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। তারপরই দেখা যায় ডাম্পের ওপর আগুন লেগে গেছে।

ভোরের দিকে আগুন নিভে গেল। কিন্তু ডাম্পের বিপর্যস্ত ধ্বংস-স্তূপের মধ্য হতে সারাদিন ধরেই ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। সকালে উঠে আমি আমার সোনার ঘড়িটাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না, কোথাও

হারিয়ে গেছে বোধ হয়। কদিন থেকে আলগা হয়ে ছিল ব্যাণ্ডটা, সারাবো সারাবো করেও সারানো হয়নি। হাসপাতালের প্রাংগণে, কিম্বা ডাম্পের মধ্যে কোথাও, কিম্বা সুড়ংগে—যে কোনো স্থানে সেটা হারিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। আমার মনে কাঁটার মত অস্বস্তি খচ খচ করতে লাগলো। ঘড়িটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত হলে আমার অবস্থা প্রতিকূল হয়ে উঠবে।

নভেম্বরের শেষে একদিন বিকালে টাউন-কমাণ্ডাণ্টের অফিসের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটী বিজ্ঞপ্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিটী এই রকম ঃ

হ্বার্টেমবুর্গ বাহিনীর একজন সৈনিককে চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। অনেকগুলি দ্রব্য তার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি বেসামরিক জনসাধারণের দ্রব্য বলিয়া অনুমিত হয়। যদি কেহ তাহা সনাক্ত করিয়া লইতে চাহেন, তবে সকাল দশটা হইতে দ্বিপ্রহর বারোটার মধ্যে এই অফিসে রিপোর্ট করিতে পারেন।

তালিকায় আমার ঘড়িটার উল্লেখ রয়েছে। ঢাকনার তলায় যে এম আদ্যক্ষর খোদাই করা ছিল, তাও উল্লিখিত রয়েছে। আমার দুশ্চিন্তার অবসান হলো। তাহলে সৈন্যটাই আমার ঘড়ি চুরি করেছে, কিম্বা অন্য কেউ চুরি করেছিল, তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

পরদিন দশটার সময় টাউন কমাণ্ডাণ্টের অফিস থেকে ঘড়িটা সনাক্ত করে নিয়ে এলাম। বাড়ী ফিরে মার কাছে শুনলাম আজ সকালে পুলিশ এসেছিল।

আমি বল্লাম, বোধ হয় মজুদকরা খাদ্যের তল্লাশে।

মা দৃঢ়স্বরে বল্লে, তাদের ধরণ দেখে মোটেই তা মনে হলো না।

আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল ?

ঠিক সরাসরি না হলেও তোমার নাম ক'বার উঠেছিল।

একঘণ্টা পরে একজন অপরিচিত লোক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, মাদামোঁয়াজেল ভ্যান আর্ণের জন্যে চিঠিটা তৈরী আছে কিনা।

লোকটাকে দেখে মনে হলো সে জার্মান, যদিও বেলজিয়ানের অনুকরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। আমি জানিনা বলতেই সে চলে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই জার্মান এজেন্ট, আমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল। মনটা কিছু দমে গেল। আমার সম্বন্ধে কিছু কি সন্দেহ করেছে ওরা ?

একটু পরেই আমার বান্ধবী আগ্‌নেস হন্তদন্ত হয়ে এসে জানালো কিছুক্ষণ আগে জার্মানরা তাদের বাড়ীর প্রতিটি নরনারীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে।

আমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলাম। মনকে শুধু সান্ত্বনা দিতে লাগলাম এই কথা ভেবে যে হাসপাতালে যে নূতন মেট্রন এসেছে সে আমার ওপর হিংসুটেপনা করে হয়তো বা আমার সম্বন্ধে কোনো গল্প রটিয়েছে। তবু যখন অল্পকাল পরে নীচের তলায় ভারী বুটের শব্দ শুনতে পেলাম, তখন একান্তভাবেই নার্ভাস হয়ে পড়লাম। শব্দগুলো ওপরে উঠে আসতে লাগলো বাতাসে কম্পমান ভীতির সঞ্চার করে। তবু যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করতে লাগলুম।

উদ্যত বেয়নেট নিয়ে দুজন সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছে আমার সম্মুখে, তাদের সংগে একজন অফিসার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দু দুবার আপনাদের আসার কারণ জানতে পারি কি ?

সে বল্ল, এখানটা সার্চ করার হুকুম আমার ওপরে। ফ্রয়লাইন, আপনাদের চাবীগুলো সব দিয়ে দিন, তাহলে সময় আর আপনদের জিনিসপত্র হয়তো নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

চাবিগুলো সমর্পণ করলাম ওর হাতে। মা ও বাবা উভয়েই বাইরে

গিয়েছিলেন। আমি একা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। দেখতে পাচ্ছিলুম অতি নির্মমভাবে তল্লাশী চলছে। দেওয়ালগুলো ভেঙে ফুটো করা হচ্ছে. প্রত্যেকটী ভালো জিনিষ তচনচ করে দিচ্ছে।

মানুষ কত সময়ই না ভুল করে। সুখের দিনে বিপদের কথা না ভেবে যারা পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটায়, আমি বোধ হয় তাদেরই একজন। নয় তো গোশলখানায় ওয়াশষ্ট্যাণ্ডের পাশে ওঁয়াল-পেপারের ফুটোর মধ্যে সংকেতিক ভাষায় লেখা দুটো কাগজের মোড়ক লুকিয়ে রেখেছিলুম, তা সরিয়ে নেবো নেবো করেও সরাই নি কেন? আমি ভয়ে কাঠ হয়ে উঠতে লাগলাম। আশংকার বিষ আমার শ্বাসরোধ করে দিতে চাইলো। আমি যেন আর প্রতীক্ষা করতে পারবো না।

হঠাৎ তাদের তল্লাশী বন্ধ হয়ে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম অফিসারটী আমাকে টাউন-কম্যাণ্ডাণ্টের অফিসে নিয়ে যাবার হুকুম দিল, গুপ্তবার্তা দুটো ঠিকই ওরা খুঁজে পেয়েছে।

আমাকে গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসা হলো টাউন-কমাণ্ডাণ্টের অফিসে। গুপ্তচর হিসাবে আমাকে অভিযুক্ত করা হলো। একটি কথাও আমাকে বলতে দেওয়া হলো না। আমাকে জেলখানার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। পথের দুধারের পরিচিত ও অপরিচিত জনতা আমাকে দেখলো—আমিও দেখলাম তাদের। দেখতে পেলাম সমবেদনার ম্লান ও বিষণ্ণ ছায়া ধীরে ধীরে নেমে এসেছে সবার মুখে।

কেউ জানে না তার কি ঘটতে পারে, যতক্ষণ না সেটা ঘটছে। কিন্তু আমি বেশ উপলব্ধি করছি আমার ভাগ্যে কি ঘটবে। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই এখানে। রাত্রির শেষে সূর্য যখন একটু একটু করে কিরণ দিতে আরম্ভ করবে, উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিবর্ষণে তখনই ঘটবে আমার জীবনের অবসান।

সামরিক কারাগারে এসে পৌছলাম। ছোট্ট একটা সেলে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে, দরজার তালা খুলে প্রহরীরা সেখানে আমাকে টেনে ফেলে দিল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আমার সম্মুখে, করিডর দিয়ে ক্রমশ মিলিয়ে আসা ভারী বুটের শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

এক সপ্তাহ পরেই আমাকে কোর্ট-মার্শালের সম্মুখীন হতে হলো। মৃত্যু অবধারিত জেনেও আমার মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। আমি আমার স্বদেশকে সেবা করেছি। বেলজিয়মের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত-প্রাণ আমার দুটি ভাই, আমিও তাদের একজন।

তাই ব্যবহারাজীবীর সাহায্য অস্বীকার করলাম। শুধু দুর্বল মুহূর্তে কোন্ সূত্রটী আমাকে গুপ্তচররূপে চিনিয়ে দিয়েছে সেটা জানার কৌতূহল ছিল। তাই অভিযোগকারীর বর্ণনা শুনে নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিলাম।

ডাম্পটী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল। একদিন একটী সৈনিক সে স্থান দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায় কয়েকটী শিশু সেখানে একটা গর্তের ধারে খেলা করছে। গর্তটী সৈনিকটীকে আকৃষ্ট করে। তদন্ত করার পর দেখা যায় গর্তের মুখটা কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ রয়েছে আর অন্য মুখটা হাসপাতালের প্রাংগণে এসে থেমেছে। সুড়ংপথে একটী সোনার রিষ্ট ওয়াচ পাওয়া যায় এবং সত্বাধিকারীর নামের আগুক্ষর ঢাকনার তলায় খোদাই থাকায় তাকে খুঁজে বার করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ কৌশল অবলম্বন করে। আমি সরল বিশ্বাসে, কিম্বা নিজের ওপর অতি বিশ্বাসে সেই ফাঁদে পা বাড়িয়েছিলাম।

দিনের পর দিন একটু একটু করে আমার বিরুদ্ধে সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল কর্তৃপক্ষের মনে। বিপজ্জনক গুপ্তচর লুলিস ডেলডনক

আমার ঘনিষ্টতম বান্ধবী, ক্লাসে কয়েকজন তাকে দেখেছিলও। আমার সঙ্গে তার দেখা করা খুবই সম্ভব ছিল, অথচ কিসের জন্য আমি তা অস্বীকার করেছিলাম? ৬৩ নম্বর গুপ্তচরকে জার্মান ভ্যামপায়ার জানলার বাইরে থেকে গুলি করে মেরেছিল, তার কাছে 'এল্' স্বাক্ষরিত কোনো একজন গুপ্তচরের বার্তা পাওয়া গিয়েছিল। সেই 'এল্' স্বাক্ষরিত গুপ্ত-বার্তা ফের পাওয়া গেছে আমাদের কাফেতে তল্লাশীর সময়।

কোর্ট-মার্শাল আমার মৃত্যু-দণ্ডের রায় দিয়েছে। দিন ও সময় পরে নির্দিষ্ট হবে। আপাতত সেই অনাগত মৃত্যুর প্রতীক্ষা নিয়ে আমাকে অন্ধকার সেলের কঠিন শয্যাব এক প্রান্তে বসে উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রহরের পর প্রহর গণনা করতে হবে।

এরপর অনেকগুলি মাস অতিক্রান্ত হলো। জেলে বসে থাকতে থাকতে মার্থা ম্যাকেন্না একদিন উত্তেজনাভরে গরাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রাচীরের বাইরে থেকে বহু-কণ্ঠে উচ্চারিত এক উন্মত্ত কল্লোল তার কানে এসে পৌছল: লড়াই থেমেছে, লড়াই শেষ হলো।

তারপর জেলের দরজাগুলো সব খুলে দেওয়া হলো, বন্দীরা সবাই মুক্তি পেল। কিন্তু মার্থা ম্যাকেন্না কোথায় যাবে, তার দেহ দুর্বল, অবিরত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে দেহে তার শক্তি নেই।

তবু একটা নূতন দৃশ্য দেখলো সে। ব্রিটিশ সৈন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। সূর্য্য-কিরণে তাদের হেলমেট ঝকমক করছে।

পথের এক পাশে পড়ে যাচ্ছিল মৃতপ্রায় মার্থা। একটী ব্রিটিশ সৈনিক তাকে ধরে ফেলে মুখের মধ্যে ব্র্যাণ্ডী ঢেলে দিল। মার্থা যেন জীবনীশক্তি ফিরে পায়। বল্ল, ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম একদিন। দুবছর আগে ধরা পড়ি—সেই থেকে বন্দী। টাকাকড়ি

কিছুই আমার নেই। আমার বাবা-মা রুলার্সে আছেন, আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও কমরেড।

ব্রিটিশ কর্পোরালটীর বাহুবন্দী হয়ে মার্থা চলে এলো রুলার্সে। ব্রিটিশ সৈনিকটী তাকে বলেছিল ঃ যুদ্ধ তো শেষ হলো, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের অনেক কিছু এখন বাকী। নোতুন করে অনেক কিছু গড়ে তুলতে হবে।

দয়ার্দ্র চোখে স্বপ্ন এনে ইংরেজটী বল্লে তারপর ঃ গড়ে তুলতে হবে তোমার ও আমার জীবন।

মার্থা বল্ল, আমি যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি। এখনো কত সময় মনে হয় সত্যি আমি জেগে আছি কি না।

• লুডহ্বিগ গ্রেণ

লুডহ্বিগ গ্রেণ

[ইংরেজ লেখক বার্নাড নিউম্যান কাল্পনিক গুপ্তচর কাহিনী লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। ভিয়েনাতে যখন তিনি গুপ্তচর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর সংগে একজন ব্যাভেরিয়ানের আলাপ হয়। সেটা ১৯৩৫ সাল, জার্মানীতে সে সময় নাৎসী শাসনাবস্থা। নাৎসীবিরোধিতার অভিযোগে লোকটী তখন জার্মানী থেকে নির্বাসিত। বার্ণাড নিউম্যানকে একতাড়া পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসে থেকে সে মিত্রশক্তির বিপক্ষে গুপ্তচরের কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। পাণ্ডুলিপিটী তার আত্মকাহিনী। বার্ণাড নিউম্যান আগ্রহে সেটী গ্রহণ করে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

বার্ণাড নিউম্যানের অন্য কাহিনীগুলির মত এটাও কাল্পনিক কিনা বলা শক্ত, তবে নিউম্যানের বিবৃতি মেনে নিলে লুডহ্বিগ গ্রেনের গল্পটীকে সত্য বলেই গ্রহণ করাই উচিত। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে কাহিনীর নায়ক সেই ব্যাভেরীয় লোকটীর নাম গোপন করে সেস্থলে গ্রেনের নাম দেওয়া হয়েছে।]

আমার বাবা ছিলেন ব্যাভেরিয়ার একজন নামকরা আইনজীবী, কয়েকটা বৎসর রাইখষ্ট্যাগে তিনি বসেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁকে কোনোদিনও চোখে দেখিনি, কারণ আমার জন্মাবার কয়েকমাস আগেই তিনি মারা যান। যেমন তাঁর আয় ছিল, তেমনি ছিল তাঁর খরচও। তাই তাঁর মৃত্যুর পর মা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

ফ্রেঞ্চ ক্যানাডার কুইবেক নগরীতে আমার এক মামা থাকতেন—তিনি সেখানে জার্মানীর ভাইস-কন্সাল ছিলেন। আমার বাল্যকালটা সেখানে কেটেছে। পরে মামা শিকাগোতে আসেন। সেখানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাই।

ব্রিটিশ ভূমিতে আমার জন্ম হলেও আর যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বৎসর ধরে বসবাস সত্ত্বেও আমি ছিলাম জার্মান নাগরিক। তাই কিছুকাল পরে আমাকে জার্মান আইনানুযায়ী বাধ্যতামূলক সমর শিক্ষানবিসী গ্রহণ করে জার্মানীতে আসতে হয়েছিল। কিছুদিন ট্রেনিং নেবার পর আমাকে ব্যাভেরীয় পদাতিক বাহিনীর ষোড়শ রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আমাদের রেজিমেণ্ট তখন মিউনিকে। প্রাথমিক শিক্ষার সময় থেকে উল্‌ফ্‌গ্যাং হেরিংজেন নামে সমবয়সী একজন জার্মান যুবকের সংগে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ঘটেছিল। আমি ও উল্‌ফ্‌গ্যাং একই রেজিমেণ্টে থাকার দরুন আমাদের ভালবাসা ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল।

১৯১২ সালের বসন্তকাল। মিউনিক আমার খুবই প্রিয় হয়ে উঠলো। উল্‌ফ্‌গ্যাংয়ের সংগে মিউনিকের প্রতিটি ক্লাব রেস্তোরা ও বিয়ার-সেলারে আড্ডা দিতাম। কোথায় সস্তায় মদ পাওয়া যায়, কোথায় সুশ্রী মেয়েদের ভিড় থাকে, উল্‌ফ্‌গ্যাংয়ের তা নখদর্পনে। একদিন রাত্রে একটী ছোট্ট কাফেতে আমরা দুজনে বসে গল্প করছি, হঠাৎ উল্‌ফ্‌গ্যাং সম্মুখে উপবিষ্ট দুটি তরুণীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মনে হলো মেয়ে দুটিও যেন মৃদু হাসলো আমাদের দিকে চেয়ে।

মেয়েদের ব্যাপারে স্বভাবতই আমি ছিলাম লাজুক, কিন্তু উলফ্‌গ্যাং আমার বিপরীত। সে ওদের কাছে গিয়ে একত্র বসে কফি-পানের প্রস্তাব করতেই মেয়েদুটি সম্মতি দিলে। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের পরিচয় বেশ জমে উঠলো। আমরা ঠিক করলাম পরেও আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

দুটী বোন ওরা—অ্যানা ও এলফ্রিডা। কয়েকদিন পরে আমি আবিষ্কার করলুম অ্যানাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি এমন কি বিয়ে করতেও রাজী আছি। কিন্তু অ্যানা আমাকে বিবাহের ব্যাপারে বিন্দু-

মাত্র উৎসাহ দিল না। উল্‌ফগ্যাংও আমার মত এল্‌ক্রিডার প্রেমে তলিয়ে গিয়েছিল, তবে বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল কিনা জানতে পারলুম না।

একদিন প্রতিদিনকার মত আমরা চারজনে ওদের ফ্ল্যাটে রয়েছি। এলক্রিডার ঘরে উল্‌ফ্‌গ্যাং প্রেমের কূজনে মত্ত। অ্যানা ও আমি বসে আছি পাশাপাশি একা। হঠাৎ লাউঞ্জের দ্বার খুলে ক্রুদ্ধ একজনকে ছুটে আসতে দেখা গেল।

চিনতে পারলাম লোকটা আমাদের রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের ক্যাপ্টেন। আমার দিকে লোকটা বুনো শুয়োরের মত তেড়ে এল, আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলাম, কিন্তু একটু পরেই জানতে পারলাম অ্যানা হচ্ছে ক্যাপ্টেনটার স্ত্রী। এই ধরণের পরিস্থিতি আমার কাছে অভাবনীয় বোধ হলেও উল্‌ফ্‌গ্যাংকে বিচলিত হতে দেখলাম না। মহিলাদের ফ্ল্যাটে জোর করে ঢোকার জন্য উল্‌টে সে ক্যাপ্টেনকেই নিন্দা করে বসলো—পরিস্থিতি তাতে আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো। আমরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। অবশেষে উল্‌ফ্‌গ্যাংয়ের প্রস্তাবক্রমে ঠিক হলো যা কিছু কথাবার্তা কালকের জন্য স্থগিত থাকবে।

পরের দিন ব্যাপার দাঁড়ালো অন্যরকম। প্রভাতেই আমাকে আমাদের কর্ণেল ডেকে পাঠালেন। তিনি আমার দিকে ক্রোধ ও বিষণ্নতা মাখা দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর ধারণা ছিল সেনাবাহিনীতে আমি একজন ভালো অফিসার হতে পারবো। কিন্তু সে ধারণা তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আমার প্রণয় কীর্তির ফলে আমি নাকি রেজিমেণ্টে কলংক লেপন করেছি। সেনাবাহিনীর শত্রুরা জুনিয়র অফিসারদের নীতিজ্ঞান-হীনতার কথা শুনলে তার সুযোগ কিরকম নেবে তা বুঝিয়ে দিলেন তিনি। বার্লিনের অমুক অমুক কাগজের লোকেরা এই সব ব্যাপার জানতে

পারলে সম্পাদকীয় মন্তব্যে কি জঘন্য প্রচার শুরু করে দেবে কর্ণেল অনেকক্ষণ ধরে সেই সব কথা বলে জানালেন যে, যে কোন মুহূর্তে আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

সেই দিনই অ্যানার কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পেলাম। অ্যানা আমাকে হঠকারিতার আশ্রয় না নিয়ে বিচারবুদ্ধি সম্মত কাজ করতে অনুরোধ জানিয়েছে। আমার প্রতি তার ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ থাকলেও স্বামীর সংগে থাকা তার কর্তব্য। সে আশা প্রকাশ করেছে বর্তমান সংকট অতিক্রম করার জন্য আমি ধীর মস্তিষ্কে চলবো।

উল্ফ্ গ্যাংকে আমার মত অবস্থায় পড়তে হয়নি। কারণ এলফ্রিডা অবিবাহিতা। কর্ণেল আমাকে জানালেন রেজিমেণ্ট থেকে আমার পদচ্যুতি অবধারিত। অ্যানা যে বিবাহিতা সে তা আমাকে পূর্বে বলেনি, সে কথা জানালে দোষটা অ্যানার ওপর এসে পড়তো তাতে আমার কিছু সুবিধা হোতো না, আমার পক্ষে অব্যাহতি পাওয়া শক্ত। কর্ণেল আমাকে বল্লেন, সম্রাটকে সেবা করার আরো অনেক উপায় আছে। তুমি ইংরেজী বলতে পারো ইংরেজদের মতই, তোমার ফরাসী ভাষাটাও চমৎকার। রণক্ষেত্র বলতে ঠিক যেখানে বুলেট ছুটোছুটি করে সেখানকেই বুঝায় না। কথা বুঝতে পেরেছো ?

হ্যাঁ, গুপ্তচরদের কথা আপনি বলতে চাইছেন।

না, গোপন দপ্তরের কথা বলছি। তোমার গুণ আছে, সাহসও আছে।

কমিশন হারাবার আশংকায় আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম। সিক্রেট সার্ভিসে যোগদান করলে আমাকে রিজার্ভ বাহিণীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে আর অ্যানাকে তার স্বামী ক্ষমা করবে এই আশ্বাস পেয়ে আমি সিক্রেট সার্ভিসে যোগদানের সম্মতি দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে আমাকে যেতে হলো বার্লিনে। ছমাস সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকার্যের পর একদিন হঠাৎ উল্‌ফ্‌গ্যাংয়ের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম সে আসছে। উল্‌ফ্‌গ্যাংও সিক্রেট সার্ভিসে যোগদান করেছে। সে আসার পর আমাদের দুজনকে ব্যাডেনের ছোট্ট একটি শহরে স্থানান্তরিত করা হলো। এখানে অপরিচিত অধ্যাপকরা আমাদের অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা দিতে লাগলেন। সাংকেতিক বার্তা, অদৃশ্য কালি ইত্যাদি অনেক জিনিষই আমরা শিখে নিলাম।

কর্ণেল নিকোলাই বক্তৃতার সময় বল্লেন, শত্রুর দেশে থেকে মূল্যবান খবর সংগ্রহ করা চতুর অফিসারদের পক্ষে শক্ত নয়; শক্ত হচ্ছে খবরগুলো স্বদেশে পাঠানো।

ক্রমশ আমরা গুপ্তচরবৃত্তিতে সুশিক্ষিত হয়ে উঠলাম। এর পর আমি ক্যানাডায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে লুডহ্বিগ গ্রেনের মৃত্যু ঘটলো, তার বদলে জন্মগ্রহণ করলো লুইস গ্রীন নামের যুবক ক্যানাডিয়ান—শিক্ষাসমাপ্তির জন্য ইংলণ্ডে গমনেচ্ছুক। এই উদ্দেশ্যে গ্রীনের সংগে ইতিমধ্যেই কয়েকটা ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রালাপও চলল। এবং ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীন ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ি দিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হবার পর আমি আমার পরিকল্পনাকে সার্থক করার কাজে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমাকে একটা নূতন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হবে—জনসাধারণের সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। তাই সমস্ত ব্যাপারেই আমি মাথা গলাতে লাগলুম। অ্যামেরিকান বল্‌ গেম্‌স ও রাগবি ফিফ্‌টিনে যোগদান করবার পর খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম আমি। বক্সিং ক্লাব, বিতর্ক-সভার আসর সর্বত্রই আমার গতিবিধি। বন্ধু-বান্ধবেরা সব সময়েই আমাকে ঘিরে থাকতো। অনেক বান্ধবীও জুটলো আমার।

সংক্ষেপে সাধারণ ছাত্রদের মতই জীবন যাপন করতে লাগলাম আমি। এমন কিছু স্বতন্ত্র ও একক কর্মপন্থা গ্রহণ করিনি যাতে অপরের সন্দেহোদ্রেক হতে পারে। কুইবেকে মামার সংগে আমার চিঠি লেখালেখি চলতো সেখানকার এক বন্ধুর মারফৎ। উল্‌ফ্‌গ্যাংয়ের চিঠিপত্রাদিও অনুরূপভাবে আরেকটী ঠিকানার মধ্যস্থতায় আমার কাছে এসে পৌঁছতো।

কিন্তু এইভাবে কতদিন চলবে? সংঘর্ষের সূচনা হবে কবে? ব্রিটিশ নৌ-বিশারদরা বলেছিল সেটা ১৯১৪ সালে, কারণ সেই বছরে কিয়েল খালের প্রশস্তিকরণ সমাপ্ত হবার ফলে বাল্‌টিক নৌবহরের যাতায়াত সম্ভব হবে। জার্মান কর্তৃপক্ষও ১৯১৪ সালে বিস্ফোরণের আশংকা করেছিল, কারণ তাদের মতে ওই বছর রুশ বাহিনীগুলির পুনর্গঠনের কাজ শেষ হবে আর ওই বছর না হলে ফরাসীদের সৈন্য-শক্তি কমে যাবে পরবর্তী বছরগুলোতে।

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে উল্‌ফগ্যাং আমাকে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবার উপদেশ দিয়ে চিঠি পাঠালো। আর জুন মাসের ২৮ তারিখের সন্ধ্যায় সারাজেভোতে আর্চডিউক ফ্রান্‌স ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁর পত্নীর হত্যার সংবাদ পড়লাম। প্রথমটা ইংরেজদের এ বিষয়ে উদাসীনতা দেখে আমার বিস্ময়বোধ হয়েছিল। বিতর্ক-সভার বন্ধুরাও এই ঘটনার সম্ভাব্য পরিণতি অনুমান করতে পারে নি। তারা যুক্তির সংগে অবাধ বানিজ্য ও শুল্ক সংস্কার, আয়ার্লণ্ডের হোমরুল ও অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো আগের মত, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না দক্ষিণ শ্লাভদের সম্বন্ধে, যার সমাধানের ব্যাপারে সমস্ত ইউরোপকেই জড়িত হতে হয়েছিল।

উল্‌ফগ্যাংয়ের কাছ থেকে কয়েকমাস আগে আসা সতর্কবাণী আমার

কাছে যথেষ্ট ছিল। আমি জেনেছিলাম সময় নিকটবর্তী। তবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। ভিয়েনা নীরব রইলো; ইংরেজী সংবাদপত্রগুলো হত্যাব্যাপারের কথা যেন ভুলে গেল। আমি অধীর হয়ে উঠতে লাগলাম। আর এই বোধ আমার মনে সর্বদাই জাগ্রত রাখলুম যে চরম মুহূর্তে হাজার হাজার ইংরেজ লুইস গ্রীনের মর্মভেদ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠবে—আমি যেন সেই মুহূর্তে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দিই।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠ-কক্ষে অধ্যয়নের অছিলায় আমি ইসলিংটনে বাসা বদল করে নিলাম। ইংল্যাণ্ডে জার্মানীর পক্ষে যে লোকটী ডাকবাক্স পদ্ধতিতে কাজ চালাচ্ছিল তার সংগে যোগস্থাপনা করার আগে তাকে যাচাই করে নেওয়াই আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল। লোকটীর নাম কার্ল গুস্তাভ আর্নষ্ট * – ক্যালেডোনিয়ান রোডে নাপিতের দোকান চালায়। জার্মান পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও জন্ম ও বসবাসের জন্য সে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক। জার্মানীর গোয়েন্দা-প্রধান ক্যাপ্টেন ষ্টাইনহাওয়ার ওর ঠিকানার মাধ্যমে লেখালেখির জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি সেটা একবারও কাজে লাগাইনি। দুতিনবার ওর দোকানে দাড়ী কামাবার ছলে গিয়ে তাকে দেখবার চেষ্টা করেছিলুম। বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব ছিল না লোকটার। আমার ধারণা ছিল ক্যাপ্টেন ষ্টাইনহাওয়ার লোকটাকে নির্বাচিত করে ভুল করেছেন, তাই তার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত তার কাছে আমার পরিচয় জানানো যুক্তি-সংগত বোধ করলুম না।

আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে ঘটনাবলীর দ্রুত সংঘটন হতে লাগলো। চার তারিখের মধ্যরাত্রে বেলজিয়ম আক্রমণের অভিযোগে ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। পরের দিন সকালে আর্নষ্টের

* মাতাহারির কাহিনী দ্রষ্টব্য।

দোকানে গেলাম - যদি প্রয়োজন হয় তবে তার কাছে আমার পরিচয় দিয়ে আমার উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ নির্দেশ এসেছে কিনা জানতে হবে।

কামাবার সময় আর্নষ্ট যুদ্ধের কথা বলতে লাগলো। আমি শুনে যাচ্ছিলাম আর ঠিক করেছিলাম উপযুক্ত সময়ে চুপি চুপি ওকে পরিচয় দেবো। কিন্তু তার অবকাশ পেলাম না। একটু পরেই সেলুনের দরজা খুলে সাধারণ পোষাক পরা তিনজন লোক এসে হাজির হলো।

একজন জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কার্ল গুস্তাভ আর্নষ্ট?

আর্নষ্ট অত্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল, তাই হঠাৎ জবাব দিতে পারলো না। প্রশ্নকারী আর্নষ্টকে চিনতোই, তাই পুনর্বার প্রশ্ন না করে বল্লে, অফিসিয়াল সিক্রেট আইনে শত্রু-দেশের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভি-যোগে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।

গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা দেখাতেই আর্নষ্ট বাধা দেবার কোনোরূপ প্রচেষ্টা না করেই হাতকড়া পরবার জন্য হাতদুটো বাড়িয়ে দিলে। বাইরে পুলিশের গাড়ী অপেক্ষা করছিল, আর্নষ্টকে তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে একজন লোক গাড়ী নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো।

তল্লাশী করার জন্য দুটোলোক রয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই নাপিতটা কি জার্মানীর গুপ্তচর?

হ্যাঁ, অফিসার একজন বল্ল, এই খবরটা আপনি রটিয়ে না বেড়ালে সুখী হবো। একে কি আপনি চিনতেন?

চিনতাম ভালো কামাতে পারে এই হিসেবে। লণ্ডনে আমি সাময়িকভাবে এসেছি, গত একপক্ষ কালের মধ্যে সপ্তাহে দুতিন দিন এখানে এসেছি, লক্ষ্য করেছি লোকটার উচ্চারণে একটু বিদেশী টান আছে। কিন্তু সে যে গুপ্তচর, তা কে জানতো।

লোকটা বল্লে, বাইরে থেকে লোক চেনা দুষ্কর। তারপর বল্ল,

আপনি যদি এখান থেকে চলে যেতে চান তো মুখের সাবানটা ধুয়ে নিতে পারেন।

বুঝলাম লোকটা আমার আলোচনা বা উপস্থিতি কোনোটাই চায় না।

আমার মনের তখন এমন অবস্থা যে মুখের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। মাত্র একদিক কামানো হয়েছে, আর একটা দিকে সাবান লাগানো রয়েছে। তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আর্নষ্টের গ্রেপ্তার আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য বিদেশীদের মত আমিও ব্রিটিশ জাতির বৈভব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছিলাম। এখানে সাধারণ নিয়মের শৈথিল্যই শুধু আমার চোখে পড়েছিল; পুলিশের হাতে যেন সামান্যই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা। পাশপোর্ট যেন এদেশে প্রয়োজনীয় নয়, মাত্র একটা নিয়মরক্ষা। কেউ যেন কোনোকিছু নিয়েই মাথা ঘামায় না। ফুটপাথে ঠেলাঠেলি এখানকার বৈশিষ্ট্য। ইংরেজরা যেন সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলাহীন। এখানে ওখানে ঘাসের ওপর দিয়ে চলা বা জঞ্জাল নিক্ষেপ করা আইনত নিষিদ্ধ হলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না নোটিশবোর্ডের নিষেধাজ্ঞার প্রতি। পুলিশের একমাত্র কাজ হচ্ছে বৃদ্ধাদের রাস্তা পার করে দেওয়া ও অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এই সব অস্বাভাবিক রকমের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল এই কথা ভেবে যে ১৯১৪ সালের ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুখী দেশগুলির অন্যতম।

ইংল্যাণ্ডের এই শৈথিল্য দেখে আমার আশা হয়েছিল এ দেশে আমাদের গুপ্তচরের কার্যকলাপ বেশ ভালোভাবেই চলবে। আমি জানতুম এখানে আমাদের কুড়িজনেরও অধিক সুদক্ষ ও বিচক্ষণ বাসিন্দা-গুপ্তচর রয়েছে। আর ইংল্যাণ্ডের মত আর কোনো দেশেই এমন সুবিধা ভোগ করতে পায় না বিদেশীরা। তাই যুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে মূল্যবান

সংবাদ আহরণ করা মোটেই অসুবিধাজনক হবে না। কিন্তু আর্নষ্টের গ্রেপ্তারে আমার সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তার গ্রেপ্তার হওয়ার অর্থ আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার বিফলতা। পুলিশ আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে আর্নষ্টের যথার্থ স্থান আবিষ্কার করতে পারলে আমাদের প্রত্যেকটী গুপ্তচরই ধরা পড়তে বাধ্য। কার্যত ঘটেছিলও তাই। ওর গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরে সমস্ত গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমি সেটা জানতে পারি কয়েক সপ্তাহ পরে।

যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য ডাক-বাক্স পদ্ধতির সমর্থন আমি কোনোদিন করি নি। আমি ঠিক করলাম আমার নিজস্ব পরিকল্পনার সাহায্যে উল্‌ফ্‌গ্যাংয়ের সংগে আমি অবিলম্বে যোগসূত্র স্থাপন করবো আর কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ব্যবহার করবো না।

৬ই আগষ্ট হোয়াইট হলে বিরাট জনতার লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং অধিক রাত্রে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের রিক্রুটিং ষ্টেশনে হাজির হলাম। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম। সে সময়ে জন্ম সার্টিফিকেটের কোনো দরকার দেখা দেয় নি। আর্মি সার্ভিস কোরে মোটর ড্রাইভার হিসাবে যোগ দিলাম আমি। আমাকে আমাদের ডিভিসনের ডেপুটি অ্যাসিষ্ট্যান্ট কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফিগসনের গাড়ী-চালক নিযুক্ত করা হলো।

জার্মান এজেন্টরূপে আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য ষ্টাফ অফিসারের বিশ্বাস অর্জন, যাতে গাড়ী চালাবার সময় তিনি আমার সংগে কথোপকথনে বিরত না থাকেন বা ছোট খাটো কাজের ভার সম্পূর্ণভাবে আমার ওপরে ছেড়ে দেন। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফিগসন ছিলেন দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের লোক, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অংশের ইংরেজদের অপেক্ষা এঁরা কম সন্দিগ্ধমনা।

ফিগসনের ডেমলার গাড়ীটা চালাবার ভার আমার ওপর ছিল। ড্রাইভারের সীটের পেছনে কাচের পর্দার আড়াল ছিল। তা সত্ত্বেও আরোহীদের কথাবার্তা শোনায় বিশেষ অসুবিধা হোতো না। একদিন কর্ণেল ফিগসনকে বলতে শুনলাম নূতন কিচেনার বাহিনীর শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 'কে' তা যুদ্ধের মধ্যে আনতে চান না। তার মানে ১৯:৬ সালের আগে আর তাদের আসা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ থেকে নিয়মিত ইউনিটগুলি পাঠানো হচ্ছে। টেরিটোরিয়ালদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

এই খবরটা আমি উলফ্‌গ্যাংকে হল্যাণ্ডের একটি ঠিকানা মারফৎ জানিয়ে দিলাম। সাংকেতিক লিপির সাহায্য না নিয়ে আমি বর্ণনা করেছিলাম এইভাবে: কিটির নোতুন বাচ্চা ভালোই আছে, কিন্তু বছর দুয়েক আগে আর তার সংগে দেখা হচ্ছে না, কারণ ওদের সংগে ভ্রমণ করার পক্ষে বাচ্চাটা এখন অনুপযুক্ত। কিটি এখন বাচ্চাকে নিজের দুধে রাখতে পারছে না, অন্যান্য ফুডের সাহায্য নিতে হচ্ছে তাকে। তাছাড়া ডাঃ ইষ্ট তাকে ভালো ভালো খাদ্য পাঠাচ্ছে।

বার্লিনে থাকবার সময় উলফ্‌গ্যাং ও আমি এই পদ্ধতিতে তথ্য পরিবেশন করাব অভ্যাস রপ্ত করে নিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য সাংকেতিক লিপির চাইতে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী।

১৯১' সালের গ্রীষ্মকালে কর্ণেল ফিগসনকে স্থানান্তরিত করা হলো বেথুন নামক স্থানে। ফ্রান্সের খনি-অঞ্চলের অন্যতম বেথুন। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই পোলিশ। খনিতে শ্রমিকের কাজ করে তারা। যুদ্ধের আগে থেকেই জার্মান সিক্রেট সার্ভিস এদের কয়েকজনকে তালিম দিয়ে ঠিক করে রেখেছিল। বেথুনে আসার আগে উলফ্‌গ্যাংয়ের নির্দেশে আমার সংগে একজন ডাচ ব্যবসায়ী সাক্ষাৎ করেছিল। ইউরোপের

বিভিন্ন দেশে তার কাজ-কারবার ছিল—কাজের তদারকে সে ঘুরে বেড়াতো সব দেশে। জার্মান গুপ্তচর হওয়া সত্বেও সেজন্য বহুকাল সে ধরা পড়ে নি। সে আমাকে ফ্রান্সের কয়েকজন জার্মান এজেন্টের নাম দিয়েছিল। বেথুনে একজনের ঠিকানা থাকায় আমি অবিলম্বে তার সংগে দেখা করার মনস্থ করলাম।

এজেন্টটির নাম জুলা রানিনস্কি। মেয়েটির নাকি একটী ধোবি-খানা আছে। যখন দেখা করতে গেলাম, তখন সে বাড়ী ছিল না। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক আমাকে অন্য একটি ঠিকানায় দেখা করতে বলে দিল।

জুলার খোঁজে শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে তাকে আবিষ্কার করে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ হোটেলটি ছিল গণিকালয় আর জুলা সেখানকার মেয়েদেরই একজন।

গণিকালয় সম্বন্ধে ব্রিটিশদের মনোভাব আমাকে সর্বদাই বিস্মিত করতো। পতিতা-বৃত্তির কুফল উপলব্ধি করা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা তা নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রচেষ্টা করে নি বল্লেই হয়। বরঞ্চ সোজাসুজি না হলেও গণিকাবৃত্তিকে ওরা পরোক্ষভাবে বাঁচিয়ে রেখে এসেছে। ব্রিটিশ সৈন্যাঞ্চলে বেথুনের এই হোটেলটী ছাড়া আরো অনেক গণিকালয় ছিল, আর ফ্রণ্ট লাইনের মাত্র পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত থাকার জন্য সৈন্যরা এখানে দিবারাত্র আসাযাওয়া করতো। হোটেলের সামনে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে দেখেছি বহু সৈন্যকে। সৈন্যবাহিনীতে অবশ্য নূতন নয় দৃশ্যটা।

কাউণ্টারে একজন মেয়েকে দেখলাম। অসম্ভব রং-করা মুখ। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো। আমি বল্লাম, জুলাকে চাই। সে জানালো জুলা এখন ব্যস্ত রয়েছে, অন্য কাউকে চাইলে পাওয়া যেতে পারে। অসম্মতি জানিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম তার জন্য।

আধঘণ্টা পরে দূরের একটা দরজা দিয়ে একটী মেয়েকে আসতে দেখা গেল—কাউণ্টারের মেয়েটা চোখ টিপে সেদিকে ইশারা করলো। আমার কাছে এগিয়ে এলো মেয়েটা। সস্তা ইংরেজীতে কথা বল্লে আমার সংগে। আমি ফরাসী ভাষায় জবাব দিলে সেও ফরাসীতে কথা বলতে শুরু করলে। আমার উদ্দেশ্য জানতে দিলাম না ওকে। আমার সংগে প্রগ্‌লভার মতই ব্যবহার করতে লাগলো। আমি ভালো করে দেখলাম ওর দিকে। ওকে নিশ্চয়ই সুন্দরী বলা চলে না। একটা কাঠিন্য বিরাজ করছে ওর সর্বাংগে। চোখ দুটো যদিও সৎ বলে মনে হলো। লম্বা ও চওড়া চেহারা, তবু লোভনীয় নয় মোটেও—একটু মুটিয়ে যাচ্ছে, বুকের দিকটা প্রায় সমতল। ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে আমি কথা বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। জানলুম সে ফরাসী নয়, পোল।

কাউণ্টারের মেয়েটাকে দাম চুকিয়ে দিতেই জুলা আমাকে হাত ধরে ওপরের একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে এলো। মাত্র বিছানা ও ওয়াশ-ষ্ট্যাণ্ড ঘরটীতে। আর বীজাণু প্রতিরোধক ওষুধের দু একটা বোতল। হঠাৎ জুলা আমাকে আদর করতে শুরু করে দিল, যে ভাবে পৃথিবীময় তার শ্রেণীর মেয়েরা করে থাকে। সে তার রঙচঙে বহির্বাস উন্মোচন করবার উদ্যোগ করতেই আমি জানালুম অন্য সকলের মত উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসি নি। আমি তার সাহায্য পেতে এসেছি। জুলার এজেন্ট নম্বর উল্লেখ করা মাত্র সে যেন বদলে গেল—আমার মনে হলো আমি যেন একজন দায়িত্বশীলা রমনীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

জুলার বর্তমান জীবিকা-বৃত্তি আমাকে চমৎকৃত করেছিল। মনের দিক থেকে সে পতিতা ছিল না, তার শারীরিক গঠনও পুরুষ ভোলানো নয়। তবু ফ্রণ্টের নিকটে সৈন্যদের কাছ থেকে মূল্যবান সংবাদ আহরণের

পক্ষে গণিকালয়ের কাজই জুলার সুবিধাজনক মনে হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের কাছ থেকে সময় সময় সত্যিকার মূল্যবান সংবাদ পাওয়া গেলেও যথার্থ খবর তাদেরই সব সময় জানা থাকে না। তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে স্থানীয় আক্রমণ সম্পর্কেই। এছাড়াও সৈনিকদের বিবৃত ঘটনাগুলি প্রায়সময়ই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। উচ্চপদস্থ অফিসার-দের বর্ণনার মধ্যে থাকে অতিরঞ্জিত কাহিনী—তারা শত্রু বন্দীদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে বলে আর নিজেদের হতাহতের সংখ্যা খুব কম করে ধরে। সাধারণ সৈনিকদের গল্পের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাবটাই ফুটে ওঠে বেশী। বুদ্ধিমান গুপ্তচর এই ধরণের শোনা গল্প থেকেই যাথার্থ্য নিরূপণ করে সংবাদ লিপিবদ্ধ করে।

জুলার বৈশিষ্ট্য ছিল সে সৈনিকদের টুপির চিহ্ন ও কাঁধের নম্বর দেখে তারা কোন ব্যাটালিয়ানের তা নির্ণয় করতে পারতো। মুহূর্তের প্রণয়ব্যাপারের অবকাশে সৈনিকরা যে সব কথা বলে ফেলতো, সেগুলোর সত্যমিথ্যা নিরূপণ না করে সে জার্মান লাইনে পৌঁছে দিত।

আধঘণ্টা রইলুম ওর কাছে। জুলাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে। আমার পে-বুকের লাইনিংএর মধ্যে লুকানো পাতলা কাগজে লেখা একটি বার্তা ওর হাতে দিলাম জার্মান লাইনে পৌঁছে দেবার জন্য, ও সেটা একটি ফাঁপা ইয়ারিংয়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্ল।

জুলার কাছে জানতে চেয়েছিলাম কিভাবে সে সংবাদগুলো জার্মানদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এবিষয়ে সে কিছু জানে না দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ওর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ান চিনে নেওয়া ও আহৃত সংবাদ পাশের গ্রামের একটি লোকের হাতে পৌঁছে দেওয়া। এই লোকটিও পোল, কয়লা খনির শ্রমিক। সে যে কি করে খবরগুলো জার্মান ইন্‌টেলিজেন্স অফিসারদের কাছে পাচার করে দেয় জুলার এ

বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। তবে সেগুলো যে জার্মান পক্ষে পৌঁছায় এ বিষয়ে জুলা নিঃসন্দেহ, কারণ বহুবার সে তার পাঠানো বার্তাগুলোর দ্রুত জবাব আর পরবর্তী নির্দেশ পেয়েছিল।

দিন পাঁচেক পরে আমি আবার সেই হোটেলে জুলার সংগে দেখা করলাম। ওর বাড়ীতে যাওয়ার চাইতে এখানে আসাই সবচেয়ে সুবিধা-জনক, কারণ এখানে সন্দেহ করার কোনো কারণই নেই। কাউণ্টারের মেয়েটা আমাকে নিয়মিত খদ্দের ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, তার হাতে প্রাপ্য মূল্য চুকিয়ে দিয়ে জুলার সংগে ঘণ্টাখানেক সময় অতিবাহিত করলাম। জুলার কাছ থেকে আমার বার্তার জবাবটাও পেলাম—সাংকেতিক লিপিতে লেখা। তাতে উল্‌ফ্‌গ্যাংয়ের স্বাক্ষরটা দেখে আনন্দিত হলাম।

ফ্রান্সে এই সময় ইংল্যাণ্ড থেকে ক্রমাগত নূতন নূতন সৈন্যবাহিনী আসছিল—এদের মধ্যে তথাকথিত 'কিচেনার' ডিভিশনেরও কয়েকটি ছিল। মার্চের সময় আর ব্যারাকে বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে আমি এদের সংগে মিশে যতটা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব কিছু জেনে নেবার চেষ্টা করতাম। ১৯১৪ সালের ভল্যান্‌টিয়ার দল এরা—সাধারণভাবে চমৎকার। কিন্তু মাত্র এক বৎসর সৈন্যবাহিনীতে থাকার দরুন নিশ্চয়ই এদের শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়। শিক্ষার সময় বেশীভাগ সময়ই নাকি এরা রুট-মার্চ করেছে, কারণ ব্রিটিশদের ধারণা ছিল পয়লা চোটেই জার্মানী ডিমের খোলার মত ভেঙে পড়বে, তখন জার্মানী অভিযানের পক্ষে লম্বা রুট-মার্চের অভিজ্ঞতা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে।

এই সব নূতন সৈন্যদলগুলির বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হলো না। ব্রিটিশ সদর দপ্তরগুলোর শৈথিল্য দেখে হাসি পায়—খাকী পরিহিত মাত্রই বিশ্বাসভাজন এদের কাছে। সামরিক

নির্দেশ ও হুকুমগুলোয় বড়ো বড়ো অক্ষরে 'গোপনীয়' লেখা থাকলেও চাওয়ামাত্রই যেন সেগুলো পাওয়া যেত। দিনের মধ্যে বহু বার আমাকে সদর-দপ্তরগুলোয় যেতে হতো—সেখানে গিয়ে টেবিলে ছড়ানো গোপণীয় কাগজপত্র ও ম্যাপগুলো দেখতে পেতাম।

এইরকম উদাসীনতা ও বিশৃঙ্খলতা সত্ত্বেও ব্রিটিশদের কাছ থেকে বেশী কিছু জানতে পারা যায় নি, তার কারণ বোধ হয় এখানে আমার মত গুপ্তচর খুব কম ছিল আর ব্রিটিশ অফিসাররাও মুখ থেকে যখন তখন কোনো কথা ফাঁস করতো না। ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে ব্যাপারটা ঠিক উলটো ছিল বল্লেই হয়।

ক্যাপ্টেন লিডেলহার্ট তাঁর হিষ্ট্রি অব দি ওয়াল্ড' ওয়ার বইতে লিখেছেন, 'সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ফ্রান্সের পশ্চাদ্ভাগ বিরাট একটা ফ্রাংকো-ব্রিটিশ আক্রমণ ও জার্মান ফ্রন্টের পতনের গুজবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।' খুবই সত্য যে এসময় রেজিমেন্টের মেস, ব্যারাক, ও ট্রেঞ্চগুলির একমাত্র আলোচ্য ছিল বৃহৎ একটা আক্রমণ। ব্রিটিশরা জয়লাভের চরম বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল।

ব্রিটিশদের একটা বিষয়ে আমি শ্রদ্ধা করি। পরাজয়ের পরও ওরা স্বতন্ত্রভাবে ও জাতিগতভাবে মনোবল হারায় না। প্রবাদ, পরাজয় কখন হচ্ছে তা ওরা জানে না আর সেজন্যই বার বার এগিয়ে আসে। অন্যান্যদের সংগে তুলনা করলে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে : ১৯১৭ সালে ফরাসীদের আশু বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর যখন তা ঘটলো না, তখন সমগ্র ফরাসী বাহিনীতে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাপোরেত্তোতে ইটালিয়ানরা হেরে যাবার পর যুদ্ধকালের মধ্যে আর তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি—পরবর্তীকালের আবিসিনিয় অভিযান হৃত গৌরব

আনয়নের প্রচেষ্টামাত্র। ফরাসী ও ইটালিয়ানদের চাইতে জার্মানদের মনোবল বেশী, তবু লুডেনডর্ফের ১৯১৮র বসন্তকালে বিজয়ের প্রতিশ্রুতির পর ব্যর্থতায় তারা নিরাশ হয়েছিল; কিন্তু ব্রিটিশদের সংগঠন স্বতন্ত্র। মহাযুদ্ধে বহু ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে ব্রিটিশ বাহিনী। ১৯ ৮র বসন্তে বিপর্যয়ের পরও তারা ফিরে এসেছিল এবং সেই বছরের শরৎকালে জার্মান সেনাবাহিনীকে স্থাণুর মত নিশ্চল করে দিয়েছিল।

গুজবের ওপর ভিত্তি করেই শুধুমাত্র সংবাদ আহরণের চেষ্টা করিনি। জুলাইয়ের মধ্যভাগে জফারের পরিকল্পনার মোটামুটি অংশ আঁচ করতে পেরেছিলাম—অয়সেনে ফরাসীদের এবং লেন্‌সের উত্তর ও দক্ষিণে ব্রিটিশদের যুগপৎ আক্রমণ। ২৭শে জুলাই তারিখের এক অধিবেশনে কর্ণেল ফিগসনকে নিয়ে যেতে হয়েছিল আমায়। সেখানে ব্রিটিশ ও ফরাসী নেতাদের বৈঠক বসেছিল। স্যার জন ফ্রেঞ্চ, স্যর ডগলাস হেগ, জেনারেল ফশ ও তাঁদের ষ্টাফের সিনিয়র অফিসারবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনাব ছোট ছোট অংশ শুনবার চেষ্টা করছিলাম।

আগষ্টের প্রথমদিকে জুলাব বার্তাবাহকের মধ্যস্থতায় আমি প্রাথমিক সতর্কীকরণ পাঠালাম এই বলে যে, লেন্‌সের চতুষ্পার্শে ফরাসী-ব্রিটিশদের আক্রমণ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তারপর গোটা আগষ্ট মাস কেটে গেল, কিছুই হলো না। অনুমান করলাম ব্রিটিশরা বোধ হয় লড়াইয়ের চূড়ান্ত অভিযান সেপ্টেম্বরে আবম্ভ করে শীতেব আগেই সোজা জার্মানীতে মার্চ করে ঢুকবার মতলব করছে।

ক্রমশ ওদের পরিকল্পনার অনেক কথাই জেনে ফেল্লাম। ব্রিটিশরা প্রথম ও চতুর্থ বাহিনীর সবশুদ্ধ ছ'টা ডিভিশন নিয়ে আক্রমণ শুরু করবে, আর ফ্রন্ট লাইনে ফাটল দেখা দিলে তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য আরো তিন ডিভিশন রিজার্ভ থাকবে। রিজার্ভ সেনাবাহিনীর মধ্যে

নবগঠিত গার্ডস ডিভিশন ও ইংল্যাণ্ড থেকে সদ্য আগত দুটী কিংনার ডিভিশন থাকবে। আমার আশ্চর্য লেগেছিল তীব্র যুদ্ধের মধ্যে এই সব নূতন অনভিজ্ঞদের এনে ঘাগী দলগুলিকে অন্যত্র রাখা হচ্ছে। আমি জানতাম ভারী কামানের ব্যবহারে ব্রিটিশরা হাস্যকরভাবে আনাড়ী কিন্তু জানতে পারলাম ওদের এই দুর্বলতা পূরণ করার উদ্দেশ্যে ওরা এক ধরণের শ্বাসরোধকারী গ্যাস আবিষ্কার করেছে। আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল ব্রিটিশদের পক্ষ থেকেই প্রথম গ্যাস ব্যবহৃত হবে।

সেপ্টেম্বর ১, তারিখের আগের সপ্তাহে আমি যতগুলি গোপনীয় সমর-তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম, তা বোধ হয় যে কোনো গুপ্তচরের সংগ্রহ অপেক্ষা বেশী। আক্রমণে যে দুটো বাহিনী অংশগ্রহণ করবে, তাদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ, গোলন্দাজ বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্য, জেনারেল গফ ও রলিনসন নামক দুজন সেনাপতির প্রকৃতি, ব্রিটিশদের সম্ভাব্য গ্যাস-আক্রমণ ইত্যাদি তথ্যগুলি সামরিক দিক থেকে অতি মূল্যবান। আক্রমণের তারিখ আর সময়ও আমি জানতে পেরেছিলাম।

পরপর এতগুলি তথ্যসংগ্রহ করার পর আমি আর একটী দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হলাম। জুলার সংগে দেখা করে জানালাম যে এইবার আমি আমার খবরগুলো নিজে জার্মান লাইনের ওপারে গিয়ে পৌছে দিতে চাই। এ বিষয়ে সে কি করতে পারে? জুলা তার বার্তাবাহকের সংগে সেদিন সন্ধ্যাতেই আমার সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করবে কথা দিল। সেই সন্ধ্যায় কর্ণেল ফিগসনের হেড কোয়ার্টার্সে আমার অন্য কাজ ছিল না। আমি নূ-লা-মাইনসে অবস্থিত একটী বন্ধুকে দেখতে যাবার অছিলায় ফিগসনের গাড়ীটা ব্যবহার করার অনুমতি চাইলাম। কর্ণেল তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন। নির্দিষ্ট স্থানে এসে জুলাকে তুলে নিলাম গাড়ীতে। কর্ণেলের একটা পাশ আমি সংগে নিয়ে রেখেছিলাম।

নু-লা মাইন্‌স পর্যন্ত যাবার পর জুলা আমাকে অ্যানেকুইন গ্রামের দিকে যাবার নির্দেশ দিল—বেথুনের কাছেই গ্রামটা। গ্রামের বাইরে রাত্রির অন্ধকারে মাঠের মধ্যে গাড়ী রেখে আমরা দুজনে কিছুদূর হেঁটে লোকটার বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

এই প্রসংগে একটা কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। এই অঞ্চলে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য পরিখা যুদ্ধ চলছিল। এক একটি খণ্ড যুদ্ধের পর দেখা যেত যুদ্ধমান দুই পক্ষের অধিকারের মধ্যে পড়ে হয়তোবা একই গ্রাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। গ্রামের একাংশ চলে গেছে জার্মানদের অধিকারে, বাকী অংশ রয়ে গেছে মিত্রশক্তির হাতে। কোনো কৃষকের গোলাবাড়ীতে হয়তো জার্মানরা শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে, আর তার ক্ষেতের ধারের গোয়ালঘরগুলিতে পাতা রয়েছে মিত্রশক্তির মেসিনগান!

১৯১৭ সালের খণ্ডযুদ্ধগুলির পর বেথুন-লেন্‌স কয়লাখনি অঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। লেনস্‌ পড়েছিল জার্মান লাইনের পিছনে, বেথুন ছিল ব্রিটিশ লাইনের এদিকে। সাধারণত কয়লাখনি-অঞ্চলে একই কোম্পানি দ্বারা সবগুলি পিটের (খনি-গহ্বর) কাজ চলতো—পিটগুলির পরস্পরের সংগে মাটির তলায় সংযোগ থাকে। বেথুন লেনস্‌ কয়লাখনিগুলির মধ্যখান দিয়ে চলে গিয়েছে ফ্রন্টলাইন—অ্যানেকুইন গ্রামে ৯নং খনির সংগে অ্যয়চি গ্রামের ৮নং খনির যোগাযোগ ছিল মাটির তলায়। জুলার বার্তাবহ এই পথ দিয়ে জার্মানদের সংগে সাক্ষাৎকার চালাতো।

লোকটার নাম কোনিন, আমার অভিপ্রায় জেনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে শপথ নিয়ে জানালো যে আমাকে সংগে নিয়ে গেলে হয়তো বিপদ ঘটবে। আমি নাছোড়বান্দা হতে সে রাজী হয়ে গেল অবশেষে।

দুদিন পরে জুলা জানালো কোনিন পরদিন রাত্রে আমাকে খনির মধ্যে নিয়ে যাবে। রাত্রের মধ্যেই কাজ হাসিল করে ফিরে আসবো বলে কর্ণেল ফিগসনকে ছুটির জন্য বলবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম না। কোনিনের ব্যবস্থানুযায়ী তার এক সহকর্মী সেদিন রাত্রে খনিতে অনুপস্থিত থাকবে। তার পরিবর্তে আমি নামবো খনিতে। সে রাত্রিটা ছিল খুবই অন্ধকার, কোনিনের দেওয়া শ্রমিকের নোংরা পোষাক পরে নিলাম। তারপর একসময় ওর সংগে খাঁচায় চড়ে নীচে নেমে নামলাম।

মাটির নীচে বিজলী আলোয় স্বল্পালোকিত গ্যালাবীর পর গ্যালারী অতিক্রম করে কতক্ষণ ধরে চলেছিলাম জানি না। দেখলাম খনির কাজ-কর্ম অত্যন্ত শ্লথ গতিতে চলছে। কার্যত দু একজন শ্রমিককে দেখতে পেলাম মাত্র। একসময় কোনিন ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, আমরা এখন ঠিক জার্মান লাইনের নীচে!

আরো কিছুটা যাবার পর একটা এঞ্জিন-ঘর দেখলাম, কোনিন বল্লে, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা হয় এখান থেকে। এখানে একজন ফোরম্যান রয়েছে, কোনিন তাকে তার কাজের সম্বন্ধে রিপোর্ট করার পর আরো এগিয়ে গেল। আরো কিছু সময় পর আমরা সম্পূর্ণ অনালোকিত স্থানে এসে পৌছলাম।

কোনিন টর্চ জ্বালিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে বল্লে। অনেকক্ষণ উঁচু নীচু পথে চলবার পর এক জায়গায় এসে কোনিন থামলো। মনে হলো বাইরের আকাশের অল্প অল্প হাওয়া এসে যেন ঢুকছে। টর্চের মৃদু আলোয় দেখলাম কোনিন ঝুলন্ত একখণ্ড দড়িতে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিল। একটু পরেই নেমে এলো একটা ঝুড়ি— কোনিন ও আমি তাতে চড়ে বসলাম।

গর্তের মুখে হাজির হলাম আমরা দুজন। জার্মানরা জায়গাটা আড়াল

করে রেখেছে ব্রিটিশদের বুলেটের লক্ষ্য থেকে। জার্মান প্রহরী একজন মোতায়েন ছিল, তাকে আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানাতেই সে অদূরবর্তী একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। আমরা সেখানে যেতেই দেখতে পেলাম পরিখার মধ্যে জার্মানদের অফিস চল্‌ছে। ইনটেলিজেন্স বিভাগেব কর্তার সংগে দেখা কবে আমার পবিচয় দিলাম, তারপর তাকে আমার সংবাদ-গুলি জানাতে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো।

সিগনাল অফিস থেকে আমাব আগমন-বার্তা জানিয়ে দিয়ে আমার জন্য কোনো নির্দেশ বয়েছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই উল্‌ফ্‌গ্যাংকে পাওয়া গেলো। সে আমাব সংগে কথা বলতে চাইলো। আমি উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলাম। কতদিন পরে আমরা দুজন পরস্পবের সংগে কথা বল্লাম।

আবার ফিরে এলাম আগের পথ দিয়ে। সংকীর্ণ অন্ধকার গ্যালারী দিয়ে সন্তর্পণে চলছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো কে যেন আমাদের পিছু পিছু আসছে। কোনিনকে বল্লাম। সে বিশ্বাস কবতে চাইলো না। এঞ্জিন-ঘর না আসা পর্যন্ত এব মধ্যে কারুর আসা অসম্ভব। ক্রমশ পায়ের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর কোনো সন্দেহ নেই— নিশ্চয়ই কেউ আসছে এপথে। টর্চ নিভিয়ে দিলাম।

লোকটা যেই হোক একটু পরেই এসে পড়বে - আমরা নিঃশব্দে অপেক্ষা কবতে লাগলাম। ত্রাসে আতংকিত বোধ করতে লাগলাম। খনির এ অংশে কারুর চোখে পড়লে আমাদেব বিপদ অনিবায গ্যালারীর এই সংকীর্ণ পথে লোকটা এই ভাবে এগোতে থাকলে আমাদের সংগে ধাক্কা লাগবেই। আমি সংকল্প ঠিক করে নিলাম। কাছাকাছি আসামাত্র আমি হঠাৎ ওর মুখের ওপর টর্চেব আলো ফেল্লাম। লোকটা একজন ফরাসী—খনির শ্রমিক তো নয়ই। নিশ্চয়ই সে ফরাসীদের

গুপ্তচর। আমাদের মত খনির এই বিস্মৃতপ্রায় পথটা নিজের কাজে লাগাচ্ছে।

লোকটাও নিজের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। অকস্মাৎ বাধা পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে সে কর্তব্য স্থির করে নিল। ডান হাতটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বার করলো তার রিভলভারটা। আমি কালবিলম্ব না করে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। গলাটা চেপে ধরলাম সজোরে। ওর হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল। আমি প্রাণপণে ওর গলাটা ক্রমশ জোরে চেপে ধরে রইলুম যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর দেহের একবিন্দু প্রতিরোধও অবশিষ্ট থাকে।

তারপর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলাম এক সময়। লোকটা পড়ে গেল ধপ্ করে। আমি টর্চ জ্বেলে তার দিকে দেখতে গেলাম। আর বিভীষিকা গ্রস্তের মত চীৎকার করে উঠলাম—লোকটা মারা গেছে!

ভয়ের চোটে মারা গেছে এমন মানুষের মুখ দেখেছেন আপনারা? কুঁচকে যাওয়া মুখ, তুমড়ানো হাঁ, খোলা চোখ, আর সেই চোখের দৃষ্টি? সেই দৃষ্টি কখনো ভুলতে পারবো না। আজও অসুস্থ শরীরে যখন ঘুম আসে অনেক চেষ্টার পর, হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়ে উঠি। সেই দুঃস্বপ্ন সর্বদাই—সেই ভয়চকিত মুখ, সেই ভীষণ মর্মভেদী চোখের দৃষ্টি আর তার গলায় আমারই আঙুলের বিষাক্ত ছাপ! একজন ষ্টাফ-অফিসারের মোটর-ড্রাইভার্ হিসাবে বেশী মৃত্যু দেখা আমার কথা নয়, তবু আশেপাশে অনেকগুলো মৃত্যু ঘটতে আমি দেখেছি। আমি দেখেছি গোলার টুকরোয় ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ। এমন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ দেখেছি, যাদের মানুষের মৃতদেহ বলে সনাক্ত করা যায় না। তবু সেগুলি বীভৎস হলেও আমার কাছে ত্রাসের সঞ্চার করে নি। কিন্তু আমার হাতে নিহত এই লোকটার মৃতদেহ আমাকে বিভীষিকায় অভিভূত করে দিল।

কোনিনের সাহায্যে মৃতদেহটা গ্যালারীর একটা বাঁকের কাছে এনে আলগা পাথর ও কয়লা দিয়ে বেশ করে ঢেকে দিলাম।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে কর্ণেল ফিগসনের কাছে আরো দক্ষিণে যাবার খবর শুনে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। কারণটা যে একমাত্র আমার যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তা নয়, জুলাকে না দেখে থাকাও আমার উদ্বেগের আরেকটা কারণ। জুলার ওপর আমার একটা স্নেহ ধীরে ধীরে জন্মেছিল। সাধারণত ওকে কেউ শিক্ষিত বলবে না, কিন্তু অন্যান্য পোল মেয়েদের মত ইউরোপীয় রাজনীতি ও দর্শনে বিশেষ আগ্রহ-শীলা ছিল সে। দর্শনশাস্ত্রে আমার ব্যুৎপত্তি একটুও ছিল না, তাই ওর বুদ্ধি ও যুক্তি আমাকে বিস্মিত করতো। দেহগত কারণে কথনো ওর প্রেমে পড়ি নি, তবু ওর মুখ আমার ভালো লাগতো। তাই অনেকবার ওকে ওর এই ঘৃণ্য জীবনবৃত্তি ছেড়ে দেবার অনুরোধ করেছি। কিন্তু বরাবরই সে প্রতিবাদ করে বলেছে ওইটাই ওর পক্ষে কাজ করে যাবার সহজতম পথ। আর বাইরে যাই ঘটুক না কেন অন্তরে সে শুচি। কাজ যখন শেষ হবে, তখনই সে গণিকালয় ছেড়ে যাবে। কর্ণেল ফিগসনের কাছ থেকে ঐ খবরটা শোনার পর ওকে জানালাম আমি যেখানেই থাকি না কেন, ও যেন আমার সংগে দেখা করে কোনিনের মারফৎ সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখে।

এক পক্ষকাল পরে আমি আমিয়েঁনে এলাম। ব্রিটিশরা এখানে সোম উপত্যকার উত্তরে একাংশ স্থান দখল করেছে। এর এক হপ্তা পরে আমরা আরো এগিয়ে কোয়েরিউ নামক ছোট্ট গ্রামে এসে হাজির হলাম। আমি জুলাকে বলে দিলাম আমিয়েঁনে এসে থাকার জন্য। এখানে থাকা ওর পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক হবে না। কারণ এ অঞ্চলে ফুর্তিবাজ

ব্রিটিশ সৈন্যদের আসার সংগে সংগে গণিকাদের ব্যবসাও বেশ জমে উঠেছে। জুলা এখানে এসে সহজেই একটা লাইসেন্স জোগাড় করে নিল, তারপর গণিকালয়ে ঢোকার বদলে আমিয়েঁনের চমৎকার পাড়ায় দুটী সুসজ্জিত ঘর ভাড়া নিলে। আমি মাঝে মাঝে সেখানে ওর সংগে দেখা করে কোনিনের কাছে আমার বার্তাগুলো পাঠাবার নির্দেশ দিতে লাগলুম।

১৭ই মে ১৯১৬। এইদিন ব্রিটিশ ফোর্থ আর্মির সেনাপতি জেনারেল রলিনসন সোমের ওপর আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে 'ফোর্থ আর্মি ট্যাকটিক্যাল নোট্‌স্' নাম দিয়ে ৩২ পৃষ্ঠার একটী ছাপানো পুস্তিকা প্রচার করলেন। আক্রমণের দিনে পদাতিকরা কোন পথে অগ্রসর হবে আর গোলন্দাজ বাহিনী কোন্ দিক থেকে সহায়তা করবে তার উল্লেখ থাকায় পুস্তিকাটী বিশেষ মূল্যবান ছিল। আমি এক কপি হস্তগত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। সুযোগও জুটে গেল একদিন। ফিগসন বইগুলির একটা পার্শেল আমাকে কোনো এক ডিভিসনের অফিসে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলেন। ইচ্ছা করেই আমি হাত থেকে ফেলে দিয়ে পার্শেলটী ছিঁড়ে দিলাম, তারপর পুনর্বার প্যাক করার সময় একটা বই সন্তর্পণে বার করে নিলাম।

বত্রিশ পাতার বই সাংকেতিক লিপিতে রূপান্তরিত করা নিঃসন্দেহে অসম্ভব। জুলাকে বল্লাম সে কথা। ওকে দিয়ে বইটা কোনিনের কাছে পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু আমিয়েঁন থেকে বেথুন যাবার পথে কোনো পুলিশ তাকে চ্যালেঞ্জ করলে ধরা পড়া বিচিত্র নয়। কয়েক-দিন আগে থেকেই একটা সন্দেহ আমার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। মিলিটারী পুলিশ গুপ্তচর সন্দেহে যে কোনো গণিকাকে তল্লাসী করতে

পারে! আর অনেকটা পথ একা ভ্রমণ করার সময় জুলার প্রতি সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

জুলা অবিলম্বে আমার সমস্যার সমাধান করে দিল। তখনকার দিনে মেয়েরা, বিশেষ করে যেসব মেয়েদের দেহ জুলার মত ঢ্যাপ্‌সা, করসেট (আঁট অন্তর্বাস) ব্যবহার করতো। করসেটের দুপাশে হোয়েল-বোন* আঁটা থাকতো। জুলা আমাকে বুঝিয়ে দিলো হোয়েল বোনের নীচে ভাঁজে ভাঁজে পুস্তিকাটীর পাতা ছিঁড়ে সেঁটে দিলে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না।

নির্বিঘ্নে জুলা সেটা কোনিনের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেটা জার্মানদের হস্তগত হয়েছিল।

এই প্রসংগে আমার ব্যর্থতার কথা বলতে চাই। আমার ধারণা হলো আমি নিঃসন্দেহে ঝানু গোয়েন্দার মত মূল্যবান একটা সংবাদ প্রেরণ করতে পেরেছি স্বদেশে। কিন্তু আমার ধারণা যে ভুল পরে তা বুঝলাম। কর্নেল ফিগসন সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে দুতিন দিনের জন্য বাইরে থাকতে প্রস্তুত হতে বলে পরবর্তী সকালে মনট্রিলের হেডকোয়ার্টার্সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যেতে বল্লেন। সেখানে মাত্র আধঘণ্টা থাকার পর আমাকে আরো বিস্মিত করে বেলজিয়ান উপকূলে ন্যাপোর্টে গাড়ী চালাবার নির্দেশ দিলেন।

এখানেও কিছুক্ষণ সলা-পরামর্শ করে সেকেণ্ড আর্মির সদর দপ্তর ক্যাসেলে এলেন কর্নেল ফিগসন। এখানে আমি প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্র-পক্ষীয় কৃতী সেনাপতিদের অন্যতম জেনারেল প্লামারকে দেখলাম।

---

* বিশেষ শ্রেণীর তিমি মাছের চোয়ালে দাঁতের জায়গায় একরকম হাড় জন্মায়—তাকে হোয়েল-বোন বলা হয়।

সে রাতটা ক্যাসেলে কাটাবার পর কর্ণেল ফিগসন ও সেকেণ্ড আর্মি সদরদপ্তরের একজন ষ্টাফ অফিসারকে নিয়ে ইয়াইপ্রেসে এলাম। এখানে সুস্পষ্টভাবে আমার চোখে পড়লো আক্রমণোদ্যোগের প্রস্তুতি। মিলিটারী ড্রাইভার ও ডেসপ্যাচবাহকদের সংগে কিছুক্ষণ গল্প করতে লাগলাম, তাদের কথাবার্তা থেকে যেটুকু বুঝতে পারলুম তাতে মনে হলো ব্রিটিশরা আমার অনুমানের অনেক বেশী কিছু করার মনস্থ করেছে। সোমে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করার পরিবর্তে ওরা এখানেও একটা আক্রমণ শুরু করবে!

পরের দিন কোয়েরিউতে আমাদের হেড-কোয়ার্টার্সে ফিরে এসে জুলার হাতে আমার নূতন অনুমান লিখে দিলাম কোনিনের হাতে দেবার জন্য। জুলা কোনিনের কাছ থেকে ফিরে আসার পর জানালো, খনির মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যরা অনবরত যাতায়াত করছে, আর শ্রমিকদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। কোনিন তাই সুড়ংগ-পথ দিয়ে জার্মান লাইনে যেতে অনিচ্ছুক। এর কদিন পরেই কোনিন গ্রেপ্তার হলো। আমরা উদ্বেগ বোধ করতে লাগলুম। কোনিনের গ্রেপ্তার হওয়ার অর্থ আমাদের বিপদ আসন্ন। জিজ্ঞাসা করলুম, কি ভাবে গ্রেপ্তার হলো?

জুলা বল্লে, যতটুকু মনে হয় আমাদের শেষ বার্তাটি নিয়ে যাবার সময়। সে রাত্রে সে বাড়ী ফেরে নি, পরের দিন সকালে একজন ফরাসী পুলিশ ওর বৌকে সংবাদ দেয় যে ব্রিটিশরা ওকে গ্রেপ্তার করে বেসামরিক পুলিশের হাতে অর্পণ করেছে।

জার্মান লাইনে পৌছে দেবার জন্য আমার যে খবরটা ওকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা একটা গানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। হয়তো প্রথমটা পুলিশ তার মর্মভেদ করতে পারবে না, কিন্তু ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কর্মচারীদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত রহস্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব নয়। আরো ভাবনার কথা,

খবরটা পৌঁছে দেবার আগে না পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানিনা। এমনও হতে পারে ইতিমধ্যেই হয়তোবা সংকেত-লিপি-বিশারদরা গানটীর মধ্যে থেকে আসল বার্তাটী আবিষ্কার করতে পেরেছে। তা যদি হয় তাহলে পুলিশ কোনিনের সমস্ত বন্ধু ও পরিচিতদের তল্লাশ কবতে করতে তার স্ত্রীর অন্তরংগ বান্ধবী জুলার খোঁজ পেয়ে যাবে এবং তারপরে হয়তো বা আমারও।

দুজনে চুপ করে ছিলাম। আসন্ন বিপদের গুরুত্ব অমাদের দুজনকেই বিচলিত করেছিল। জুলা ভয় পায় নি বলেই মনে হয়েছিল প্রথমটা, কিন্তু একটু পরেই সে নার্ভাস হয়ে পড়লো। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়লো। আমাকে জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, যদিও আমি নিজেও কোনো সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম না।

একসপ্তাহ পরে মেয়েকে দেখতে আসার অছিলায় জুলার মা আমিয়েঁনে এসে জানিয়ে গেলো কোনিনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সন্দেহজনক কিছুই পায় নি তার কাছ থেকে। জার্মান লাইন থেকে ফিরে আসার সময় খনির পরিত্যক্ত গ্যালারীর মধ্য দিয়ে আসতে দেখে ব্রিটিশ সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার কবেছিল। কোনিন কৈফিয়ৎ দিয়েছিল যে তার কাজের স্থবিধার জন্য গ্যালারীর ওই দিকগুলোতে মধ্যে মধ্যে তাকে যেতে হয়ই কারণ তাকে দেখতে হয় কোথাও পতনের সম্ভাবনা আছে কিনা। আশ্চর্যের কথা খনির কর্তারা ওর কৈফিয়ৎ সংগত বিবেচনা করে ওকে ছেড়ে দেবার স্থপারিশ করেছিল। প্রমাণাভাবে ওকে ছেড়ে দেওয়া হলেও কর্তৃপক্ষের সন্দেহ অবশ্য এখনো যায় নি। তাই তাকে ও তার স্ত্রীকে এ অঞ্চল থেকে সরিয়ে একেবারে ফ্রান্সের দক্ষিণে নারবোন নামক স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে হপ্তায় একদিন করে ওকে নিকটবর্তী পুলিশ-ষ্টেশনে হাজিরা দিতে হবে।

দুর্ভাবনার হাত থেকে আপাতত মুক্তি পাওয়া গেল। শুধু কোনিনের ব্যাপারটাই নয়, অন্য একটা ঘটনাও আমাকে বিচলিত করেছিল। কোনিনের গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিন আগে আমি কিছুক্ষণের অবকাশ পেয়ে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে বল্ল : অবাক কাণ্ড, গ্রেন, এখানে !

আমার আসল নামের উল্লেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পিছনে তাকাতেই দেখলাম আমার স্কুলের বন্ধু পাওয়েল রয়েছে দাঁড়িয়ে। যখন আমি কুইবেকে পড়তাম জার্মান ভাইস-কন্সালের ভাগ্নে জার্মান-সন্তান লাডউইক গ্রেন এই যথার্থ পরিচিতি নিয়ে, তখন ও আমার সহপাঠী ছিল।

অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। ভান করতে যাচ্ছিলাম আমি গ্রেন নই, অন্য ব্যক্তি। কিন্তু বলার সুযোগ পেলাম না। সে আরেক জনকে চীৎকার করে ডেকে আনলো, বল্ল, মিডোজ, ত্বাখ্ কে এখানে !

আরেক জন অল্প দূরে দাঁড়িয়েছিল। দেখলুম সে-ও আমাকে চিনেছে। সে যে আমাকে কখনো ভুলবে না আমি জানতাম। কারণ ছেলেবেলা থেকেই তার সংগে আমার রেশারেশি ছিল। দল পাকিয়ে সে আমার জার্মান জাতীয়তাকে কেবলি বিদ্রূপ করতো আর আমি তাকে ঠ্যাঙানি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করতুম।

আমাকে প্রথমে দেখেছিল পাওয়েল। বেশ সাদাসিদে, ছেলেটা আমাকে অনেক দিন পরে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছে বলেই মনে হলো। সে প্রস্তাব করলো, আমাদের এই হঠাৎ দেখার খাতিরে চলো কোথাও গিয়ে একটু মাল খাওয়া যাক।

দেখলাম মিডোজ সেই আগের মতই আছে। তাকে মোটেই উৎসাহিত দেখলুম না, যদিও করমর্দন করলো বন্ধুতার সংগেই।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য আমিই ওদের জিজ্ঞাসাবাদ

করতে লাগলাম। জানতে পারলুম ওরা দুজনেই একটি ক্যানেডিয়ান ক্যাভাল্‌রি রেজিমেণ্টের অফিসার। ব্রিটিশ লাইনের পিছনে অবস্থান করছে ওরা—শত্রুব্যূহে ফাটল সৃষ্টি হলে ভেতরে ঢুকে পড়ার অপেক্ষায়।

পাওয়েল উৎসাহের সংগে আমাদের নিয়ে চল্ল কাফেতে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কর্পোরাল বলে সেখানে ঢুকতে পেলাম না। অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট কাফেতে সাধারণ সৈনিকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এক এক করে অনেকগুলো জায়গায় ঘুরলাম আমরা, সব জায়গাতেই একই ব্যাপার। বিরক্ত হয়ে আমরা শেষে একটা পার্কে বসে পড়লাম।

পাওয়েল বল্লে, এখানে আবার কোনো মিলিটারী পুলিশ না এসে বলে বেঞ্চিগুলো নার্সদের জন্যে নির্দিষ্ট। যাকগে, এবার তোমার খবর বলো। কেমন চল্‌ছে? আমাদের সংগে এলে না কেন?

আমার কিছু বলার আগে মিডোজ যে প্রশ্নটা করলে, মনে মনে সেটাই আমি শংকিত ভাবে আশা করছিলুম এতক্ষণ: আমার কিন্তু বরাবরই ধারণা ছিলো গ্রেন যে তুমি খাঁটি জার্মান—তোমার মামা কুইবেকে ভাইস্‌-কন্সাল ছিলো না?

আমি জানালুম, হ্যাঁ। জার্মান রক্ত আমার রয়েছে বটে, কিন্তু কার্যত আমার সব সময়টাই ব্রিটিশ রাজ্যে কেটেছে। তারপর মিথ্যার আশ্রয় নিলাম, কুইবেক থেকে মাত্র কয়েক মাসের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর মামা লিভারপুলে বদলি হন। তিনি শুধু যে ভাইস-কন্সাল ছিলেন তা নয়, ব্যবসাও করতেন সেখানে। আর শেষকালে কন্সালের চাকরী ছেড়েও দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে জেঁকে বসবার পর যেই দেখলেন লড়াই আসন্ন হয়ে উঠেছে, তখুনি তিনি জার্মান নাগরিকত্ব ছেড়ে দিলেন, আমিও তাই করেছি। জন্মাবার পর জার্মানীতে যাই নি কখনো। আমার

যা কিছু স্বার্থ তা ইংল্যাণ্ডেই। আর লড়াই যখন শুরু হয়, তখন আমি ইংল্যাণ্ডের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মনে হলো পাওয়েল আমাকে বিশ্বাস করেছে। মিডোজ করেছে কিনা বুঝতে পারলুম না। তারপর অনেক কথাবার্তা হলো। আমি সতর্কতার সংগে আমার রেজিমেণ্টের নম্বর আর ঠিকানা এড়িয়ে গেলাম। কি জানি, মিডোজ ইচ্ছা করলে আমাকে এখুনি, নয় তো বা পরেও পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে পারে কেবল সন্দেহের বশেই। যাই হোক, পরে একহপ্তার মধ্যে আবার এখানে দেখা হবে আশ্বাস দিয়ে চলে গেল ওরা।

এরপর মিডোজের কথা চিন্তা করে কেবলি মনে অস্বস্তিভোগ করেছি। এর ওপর কোনিনের গ্রেপ্তারের খবর শুনে একেবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। তার মুক্তি লাভের পরই একদিন কন্টিনেণ্টাল ডেলি মেলের পাতা ওল্টাতে গিয়ে 'সাংঘাতিক আহত'দের নামের তালিকায় 'লেফ্‌টেন্যান্ট ডব্লু. ই. মিডোজ - ফোর্ট গ্যারী হর্স' দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলুম। মিডোজ সাংঘাতিক আহত। তার মানে নিশ্চয়ই তার মৃত্যু ঘটবে। তার অর্থ আমার নিরাপত্তা। ঈশ্বর, যেন তাই করেন।

উলফ্‌গ্যাংয়ের কাছ থেকে বিশেষ একটি বার্তা নিয়ে একদিন একটা ভ্রাম্যমান এজেণ্ট আমাদের সংগে দেখা করবার জন্যে এলো। ব্রিটিশ বাহিনীর লড়াইয়ের নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে চেয়েছে উলফ্‌গ্যাং। জুলার ফ্ল্যাটে গিয়ে বার্তাবাহকটীর সংগে দেখা করলাম। বার্তাটা নিয়ে এসেছে একটী তরুণী সুইস মেয়ে—বার্ণে আমাদের গুপ্তচর বিভাগের সংগঠন তাকে দলভুক্ত করেছিল। শুধু সংবাদ বহন তার কাজ। এ কাজে তাকে উপযুক্ত বলেই মনে হলো, কারণ বছরে তিনচারবার সে সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে আসাযাওয়া করে পৈত্রিক ব্যবসা

সংক্রান্ত কাজে—প্যারীতে তাদের ঘড়ির ব্যবসার একটা শাখা প্রতিষ্ঠান আছে।

উলফ্‌গ্যাংয়ের নির্দেশ জানবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিনের মধ্যে খবরটা দিতে হবে?

সে বল্ল, আমার প্যারীর কাজ আর একহপ্তার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে—তার পরেই আমাকে চলে যেতে হবে।

মেয়েটীর ইচ্ছা অন্য কাউকে দিয়ে যেন আমাদের খবরটা পাঠানো হয়। স্পষ্টই বোঝা গেল সে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। জুলা তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে, ভাবনা নেই, এবারে আমরা নতুন উপায়ে খবরাখবর পাঠাবো।

মেয়েটা চলে যাবার পর জুলা আমাকে বল্লে, ওর নিকারের* নীচেয় ধারে এমন এমব্রয়ডারী করে দেবে যে সেলাইয়ের ফোঁড় দেখলেই আমাদের পরিকল্পনার অর্থ বোধগম্য হবে। যেমন ৩০তম বাহিনী বোঝাতে হলে সে একটা ফুল ও তার সংগে লতাপাতার এমন একটা ডিজাইন তুলে দেবে যে ফুলটার পাপড়ি গুনলেই দেখা যাবে ত্রিশটা হয়েছে। আর অষ্ট্রেলিয়ান, ক্যানেডিয়ান, ক্যাভাল্‌রি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ডিভিশনগুলো বিভিন্ন রংয়ের সুতোয় বোনা ফুলে রূপান্তরিত হবে, কোন রংটা কার সেটা মনে করে রাখবে মেয়েটা। আমি পরামর্শ দিলুম রণক্ষেত্রের বাহিনীগুলোকে ফুল হিসাবে দেখিয়ে রিজার্ভ ডিভিশনগুলোকে মৌমাছি ও প্রজাপতিরূপে দেখালেই চলবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হয় নি। ফ্রন্টের বিভিন্ন স্থানে কর্ণেল ফিগসনের সংগে কদিন ধরে ঘোরাফেরার ফলে আমি যতটা সম্ভব অনুমান করে নিয়েছিলাম। জুলাকে খবরগুলো ভালো করে বুঝিয়ে দিতেই সে উৎসাহের সংগে মেয়েটীর জন্য নতুন নিকার কিনে এনে এমব্রয়ডারী শুরু করে দিলে। বলাবাহুল্য জুলা ওর একটা

* মেয়েদের অন্তর্বাস—জাঙিয়া।

মাপ আন্দাজ করে নিয়েছিল। তারপর সপ্তাহকাল পরে মেয়েটী যখন এলো, তখন তাকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে জুলা তাকে নিকারটা পরে নিতে অনুরোধ করলো।

মেয়েটা ইতস্তত করছিল। গুপ্তচর বা বার্তাবাহক যাই হোক না কেন, ঘরের মধ্যে আমি থাকায় সে লজ্জা পাচ্ছিল। আমি অগত্যা অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

কিছুদিন পরে আরেকবার মেয়েটী এসেছিল। আমার হাতে তখন কয়েকটা খবর ছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোনো খবর পাঠাতে হবে কিনা, আমি জানালুম, খবর সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, কিন্তু তা পাচার করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটী বল্ল, এমব্রয়ডারী পদ্ধতিটা পুরোনো হয়ে গেছে, একটা মেয়ে সেদিন ধরাও পড়েছে এমব্রয়ডারী শুদ্ধ।

তাহলে কি করা যায়? আর তুমিও লিখিত বার্তা নিয়ে যেতে নারাজ?

মেয়েটী একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বল্লে, কত বড় হবে?

বড় হবে বৈকী—গোটা একটা বিষয় পঞ্চাশ ষাটটা কথায় নামিয়ে আনলেও কতগুলো ফিগার (চিত্র) থাকবে। সব মনে করে রাখাও তোমার পক্ষে কষ্টকর।

সাংকেতিকের সাহায্য নেবেন তো?

নিশ্চয়ই, আমি বল্লাম।

তাহলে প্রস্তুত করুন।

বার্তা তৈরী করার পর জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে নিয়ে যাবে বলো দেখি?

মেয়েটী বল্ল, প্রথমে আমাদের কিছু অদৃশ্য কালি দরকার।

আমি অবাক হয়ে বল্লাম, এই তোমার বুদ্ধি! ফ্রন্টিয়ারে অদৃশ্য কালির পরীক্ষা হয় জানো না বুঝি?

সে কোনো কথা না বলে জুলাকে এক গামলা গরম জল আনতে বল্লে। তারপর তার পায়ের মোজা খুলে গরম জলে ডুবিয়ে দিল, মোজাতে অদৃশ্য কালি মাখানো ছিল। পশমের জাম্পারটাও সে খুলে ফেল্ল। তারপর একটু হেসে পেটিকোটটাও একটান দিয়ে ফেলে দিল। দেখলাম ছোট্ট একটা ভেস্ট রয়েছে বুকে। সেটাও সে একটু পরেই খুল্লো—দেহের ঊর্ধ্বাংগ সম্পূর্ণ নগ্ন রইলো। আমার আশ্চয লাগলো কিছুদিন আগে নিকার পরতে যার আপত্তি হয়েছিল, আজ সেই মেয়েটাই আমাব সামনে উন্মুক্ত বক্ষে দাঁড়িযে আছে।

মেযেটা অদৃশ্য কালি দিয়ে তাব পিঠে বাতা লিখে দিতে বল্লে। আমি সেলাইয়ের কাঁটা দিয়ে তাব পিঠে লিখে দিলাম। মেযেটা বল্লে, গ্যাসের আগুনের তাপে লেখাগুলো ফুটে উঠবে।

একটা অসুবিধা ছিল এক্ষেত্রে। পিঠের ওপর চাপ পড়লে লেখাগুলি মুছে যেতে পারে। মেয়েটাকে সেজন্য যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

উলফ্ গ্যাংযেব কাছ থেকে এরপব যে নির্দেশ এসেছিল তা আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল। ব্রিটিশদের হাতে যে সকল জার্মান যুদ্ধ-বন্দী রয়েছে তাদের দিয়ে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ব্রিটিশদের রিজার্ভবাহিনী কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ব্রিটিশদের হাতে প্রায় ৭০,০০০ হাজাব বন্দী জার্মান সৈন্য রয়েছে। এদের অর্ধেকেরও বেশীকে ফ্রান্সে লাইনের পশ্চাতে শ্রম-কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। হেগ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্দীদের বিপজ্জনক এলাকায় রাখা উচিত না হলেও ব্রিটিশরা এই নিয়ম পালন করে নি। বন্দী হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই রণক্ষেত্রে এদের দিয়ে মৃতদেহ কবর দেওয়া হচ্ছিল। এই কাজে অনেকে মারাও পড়েছিল।

উলফ্ গ্যাংয়ের নির্দেশ পাবার পর থেকে আমি উপযুক্ত উপায়

উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে লাগলুম। যুদ্ধ-বন্দীদের শ্রম-সংগঠনগুলি একবার দেখে নেওয়া দরকার। ফিফ্‌থ আর্মি এলাকায় দেখলাম প্রায় সাত হাজার জার্মান যুদ্ধ-বন্দীকে বিভিন্ন কোম্পানীতে গড়পড়তা ৫০০জন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটী স্থানে প্রায় তিরিশজন ব্রিটিশ রক্ষী ওদের পাহারা দেয়।

যতই চিন্তা করতে লাগলুম, ততই বিরাটতর সম্ভাবনার কথা উদয় হতে লাগলো। উলফ গ্যাং বলেছে, জার্মান আক্রমণ শীঘ্র শুরু হবে, বিদ্রোহ যেন সেইদিনই সংঘটিত হয়। আক্রমণের তারিখ আগেই আমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

যুদ্ধ-বন্দীদের কোম্পানী একদিন রাস্তার কাজ করছিল, সেখান দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছা করেই গাড়ীটাকে নালার মধ্যে ফেলে দিলাম। রক্ষীদলের সার্জেণ্টটীকে বলে কয়েকজন বন্দীকে চেয়ে নিলাম। ওরা যখন আমার গাড়ীটা রাস্তার ওপরে তুলবার চেষ্টা করছিল, তখন ওদের ভালো করে দেখতে লাগলুম। একজন কর্পোরাল বন্দীকে দেখে মনে হলো—হ্যাঁ, এই রকম কয়েকজন লোক পেলেই চলবে। রক্ষীটার দিকে আড়াল করে ফিস্‌ফিস্ করে তাকে বল্লাম, এই কাগজটা একা থাকার সময় পড়ে নিও।

লোকটা প্রথমটা জন্য বিস্মিতবোধ করলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার হাত থেকে টুকরো কাগজটা নিলে। কাগজটীতে আমার পরিকল্পনার সারাংশ লিখে দিয়ে জানিয়েছিলাম: কাল আমি এপথ দিয়ে যাবো। আমার মতলব বুঝে তা কার্যে পরিণত করতে রাজী থাকলে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ করো। আর এই কাগজটা অবিলম্বে নষ্ট করে ফেলো।

পরের দিন ওখান দিয়ে যাবার সময় দেখলাম লোকটা আগ্রহের সংগে

জোরে নিঃশ্বাস ফেল্ল। বুঝতে পারলুম সে আমার পরিকল্পনায় সাহায্য করতে রাজী আছে।

এইভাবে যুদ্ধ-বন্দীদের আটটা কোম্পানী আমার হাতে এলো। অন্যান্য যারা রাজী হয় নি, তাদের কাপুরুষতায় আমি দোষ দিতে পারি নি। দ্বিতীয়বার মৃত্যুর মুখোমুখী কে-ই বা হতে চায় ইচ্ছা করে ?

এই প্রসংগে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেটা আমার ইতিপূর্বে করা উচিত ছিল। জার্মানীতে জনৈক ব্রিটিশ যুদ্ধ-বন্দীর সংগে আমার পত্রালাপ চলতো -নিরপেক্ষ দূতাবাস মারফৎ। ব্রিটিশ যুদ্ধ-বন্দীটী আমাকে চিনতো না। জার্মান গুপ্তচর বিভাগের নির্দেশে আমি তার নাম ঠিকানায় চিঠি পাঠাতুম। সে সব খবর খুব জরুরী ধরণের নয়, সেগুলি যে কোনো সাধারণ বিষয়ের মধ্যে কৌশলে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্রিটিশ যুদ্ধ-বন্দীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতাম। বলা বাহুল্য তার কাছে আমার চিঠি কোনোকালেই পৌছতো না, জার্মান গুপ্তচর বিভাগ সেগুলি গ্রহণ করতো আর প্রয়োজন হলে তার নামে আমাকে চিঠি দিত।

এই যুদ্ধ-বন্দীর কাছ থেকে আমি হঠাৎ একদিন চিঠি পেলাম। বন্দী বিনিময় ব্যবস্থার ফলে সে ছাড়া পেয়ে ১১ই মার্চ নাগাদ বাড়ী পৌছবে আশা করছে।

চিঠিখানা যে উলফ্‌গ্যাংয়ের লেখা সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না।

বুঝতে পারলুম ১১ই মার্চ জার্মান আক্রমণের দিন।

হাতে মাত্র কয়েকটা দিন আছে আর। আমি তৎপর হয়ে উঠলাম। বন্দী কোম্পানীগুলোকে জানিয়ে দিলাম মার্চের দশ তারিখে বিদ্রোহ করতে হবে সেদিন কেউ কাজ করবে না, কোনোরকম শৃঙ্খলা মানবে না। শ্লোগান তুলে সবাই বেরিয়ে আসবে ক্যাম্প ছেড়ে।

ইংরেজরা হাতিয়ার দেখিয়ে বশ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে না। ১১ কিম্বা ১২ তারিখে লড়াই যত কাছে আসবে, ততই চেষ্টা হবে যুদ্ধ-বন্দীদের পিছু সরিয়ে নিয়ে যাবার। এই সময়ে ধর্মঘট বিদ্রোহের সামিল হয়ে ওঠে যেন। রক্ষীদের সংখ্যার জোরে কাবু করে অস্ত্রগুলো কেড়ে নিতে হবে।' তারপর সুবিধাজনক স্থানে পরিখা খুঁড়ে তার মধ্যে অবস্থান করে রাইফেল, মেসিনগান ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য হানা দিতে হবে। আশপাশ দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা গেলেই তাদের আক্রমণ করতে হবে।

আমার এই কথাগুলোকে যেন জার্মান সম্রাটের নির্দেশ বলে মেনে নেয় ওরা।

ইংরেজরা এই সময়টা অত্যন্ত পরিশ্রমের সংগে যুদ্ধ-ব্যবস্থা গড়ে তুলছিল। ফরাসীদের বছরের পর বছর ধরে ঔদাসিন্য ও অবহেলার ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করছিল ওরা। আমি জেনেছিলাম আমাদের চল্লিশটী ডিভিশন এবারের আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সে জায়গায় ওদের ফিফ্‌থ আর্মিতে মাত্র চোদ্দটী ডিভিশন রয়েছে।

একটা মোটর-সাইকেল চেয়ে নিয়ে আমি প্রায়ই যুদ্ধ-বন্দীদের কোম্পানীগুলি পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলুম সুযোগমত। তৃতীয় সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগেও আমার কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বস্ত এজেন্টের অভাববোধ করতে লাগলুম—কয়েকজন জার্মান অফিসার, বন্দীদের কোম্পানীর মধ্যে যাদের ঢুকিয়ে দিলে অনেক সুবিধা হতো।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো একদিন একজন লোক—বাহ্যত একজন ফরাসী সাংবাদিক—এসে আমাকে জানালো আক্রমণ স্থগিত রাখা হয়েছে ২১ তারিখ পর্যন্ত। এর অর্থ আমার সমস্ত পরিকল্পনার

অপমৃত্যু! আমি আতংকিত হয়ে উঠলাম খবরটা শুনে। এখন আমার পরিকল্পনা স্থগিত বা সংশোধিত করা অসম্ভব—সময়ও নেই সুযোগও নেই। আমাকেও এ সময় হেড-কোয়ার্টার্সে বিশ্রীরকমভাবে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। কয়েকদিনের চুপচাপ থাকার পর আমাকে নিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিগসন এক একটা কোরের সদর দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করেছেন। আমি যেটুকু সময় ফাঁক পেতে লাগলুম, তাই কাজে লাগাবার চেষ্টা করলুম—তবু মাত্র তিনটী কোম্পানীকে সতর্ক করে দেবার সুযোগ পেলাম, বাকীগুলিকে তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রইলো না।

৫ই মার্চ হতভাগ্য এগারোটা কোম্পানী ধর্মঘট শুরু করলো। অফিসার ও রক্ষীরা তাদের রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রহার করে কাজে প্রবৃত্ত করবার চেষ্টা করলো। কতকগুলি ক্যাম্পে বন্দীরা তাদের তাবু ও কুটিরের মধ্যেই ছিল, বাইরে আসতে অস্বীকৃত হয়েছিল। কতকগুলি জায়গায় ওরা ওদের কাঁটাতারের ঘেরার মধ্যে মার্চ শুরু করেছিল। আর্মি হেড-কোয়ার্টার্সগুলিতে দস্তুরমত বিস্ময়ের আলোড়ন শুরু হলো। সর্বদাই টেলিফোনের ঝংকারে অফিসগুলো বিরক্ত হয়ে উঠলো। রিজার্ভ ডিভিশনগুলি থেকে সৈন্য বার করে এনে দ্রুত পাঠানো হতে লাগলো ক্যাম্পগুলোতে। ফিগশন একটী ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন, আমি দেখলাম সেটী মেসিনগান দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ রিজার্ভদের ভালো করেই ব্যস্ত রাখা গিয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্রোহ জার্মানদের আক্রমণের দশদিন আগেই হওয়ায় কোনো কাজে লাগলো না।

২০শে মার্চ রাত্রে সারাটা দিন ফিগসনের সংগে ব্যস্ত থাকার পর একজন অফিসারকে চালনি থেকে নিয়ে আসছিলাম। তাকে যথাস্থানে

পৌঁছে দেবার পর ম্যানিকোর্টের কাছে আমার গাড়ীটা ধাক্কা খেয়ে উল্‌টে পড়লো, গাড়ীটা ভেঙে গিয়েছিল আর আমিও মোটামুটি আঘাত পেয়েছিলাম। স্থানীয় ফিল্ড এ্যাম্বুল্যান্স থেকে টেলিফোনে আমার হেডকোয়ার্টার্সে ফিগসনকে খবরটা দেবার জন্য বলে এটুকু জানালুম যে স্থানীয় ক্যাজুয়াল্‌টি ক্লিয়ারিং ষ্টেশনে যেতে হচ্ছে আমাকে। ফিল্ড এ্যাম্বুল্যান্সের নম্বর উল্লেখ করার আগেই টেলিফোনের লাইন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

দুর্ঘটনা আমার পক্ষে মস্ত সুবিধা হয়ে দাঁড়ালো, আমি ভাবলুম পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যেই ফিল্ড এ্যাম্বুল্যান্স আমার কথা ভুলে যাবে। আমার আসার তারিখটাই লিপিবদ্ধ আছে, প্রস্থানের দিন লেখা থাকবে না। ভোর বেলাতেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর ঠিক পাঁচটার সময় পূর্বদিক থেকে কামানের আওয়াজ শুনতে পেলাম। হ্যাঁ, আজই, সেই দিন।

কুর্চি থেকে ম্যানিকোর্ট—পথঘাট আমার সবই জানা। এখানে এক কিলোমিটার পরিমিত স্থানে আটজন রক্ষী বেষ্টিত অবস্থায় দুশো জার্মান বন্দী ছিল। প্রথম কথা বলি আমি এদের সংগেই—আমাকে দেখামাত্রই চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল সবার। ক্রমে প্রায় বারোজন লোক রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়লো যেমন করে ফুটবল খেলোয়াড়রা গোলের সামনে জড় হয় ফ্রি কিক প্রতিরোধের জন্য। হঠাৎ দুজন লোক লাফিয়ে পড়লো রক্ষীটার ওপর নিঃশব্দে, ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে কাজ হাসিল হয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে আমার হাতে একটী সৈন্যবাহিনী এসে গেল। আটজন ইংরেজ রক্ষীই নিহত হয়েছিল। আমি একটা রাইফেল নিয়ে রক্ষী সেজে পাহারা দিতে লাগলুম চলমান ব্রিটিশ সৈন্যদের চোখে ধুলো

দেবার উদ্দেশ্য। মৃতদেহগুলো পথের পাশে রাস্তা তৈরীর উপকরণের বিরাট স্তূপগুলির নীচে চাপা দিলাম। নিহত রক্ষীদের উর্দিগুলো পরে নিল আটজন বন্দী।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই চিন্তিত হয়ে উঠলুম। যখন বন্দী ও রক্ষীরা সন্ধ্যায় যুদ্ধ-বন্দী ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে যাবে না, তখনই হৈ চৈ শুরু হবে। কিন্তু তার এখনো কয়েক ঘণ্টা দেরী। ইতিমধ্যে আমাদের কোম্পানী নিয়ে ক্রেসীর কাছে হাজির হলুম। গ্রামের বাইরে ওদের রেখে আমি এখানকার হেডকোয়ার্টার্সে এলাম। টেলিফোনটা চেয়ে নিয়ে যুদ্ধ-বন্দী ক্যাম্পে ফিফ্‌থ আর্মির তরফ থেকে জানিয়ে দিলাম নেস্‌লের কাছে রাস্তার কাজ করার সময় কোম্পানীর লোকদের আরো দূরে রক্ষা-কার্যের জন্য ধারস্বরূপ নিয়ে যাওয়া হয়েছে—দুএকদিনের মধ্যে এরা ফিরবে।

মার্চ করে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। লিবেরমণ্টে এসে লক্ষ্য করলাম খালের ধারে ডাম্প রয়েছে কয়েকটা। আমি স্থির করলাম রাত্রে সেগুলির ওপর হানা দিতে হবে। ছজন রক্ষী পাহারা দিচ্ছে ডাম্প। রাত্রে দুজন রক্ষীকে কাবু করে ফেল্লাম, আর দুজন এসে পৌছলে তাদেরও শেষ করে দিলাম। বাকী দুজনকেও তাই করা হলো—একাজে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হলো না—কারণ আমাদের দেহে ব্রিটিশ উর্দি থাকায় কেউই আমাদের সন্দেহ করে নি। ওদের উর্দিগুলো আমরা খুলে নিয়ে মৃতদেহ খালের জলে ফেলে দিলাম। সাতটা রাইফেল, প্রায় সাতশো রাউণ্ড গুলি আর একটা মেশিনগান সংগ্রহ হলো। কিছুটা অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়েছে আমাদের, এবার চাই রসদ।

প্রভাতে আরো পূর্বদিকে এগোতে লাগলুম। পুরোনো লাইন ছাড়িয়ে আমরা দশ মাইল এগিয়ে এসেছি। এদিকে ব্রিটিশদের সামান্য

রিজার্ভস্ আছে। দেখতে পেলাম দুটো ক্যাভালরি রেজিমেণ্ট যাচ্ছে। একজন অফিসার কৌতূহলী হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে :

—এরা কে, কর্পোরাল ? সদ্য বন্দীর দল ?

—না স্যর, যুদ্ধ-বন্দীদের লেবার কোম্পানী।

—একটু বেশীই অগ্রসর হয়েছো, তাই না ?

—কি করা যাবে এসময়ে ! গ্রীন লাইনে যথাসময়ে এদের নিয়ে পৌছতে পারলে কাজ করবে ওরা সেখানে।

বিকালে আমাদের রসদ জুটে গেল। আমাদের নজরে পড়লো একটা আর্মি সার্ভিস কোর জি. এস. ওয়াগন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, ঘোড়াগুলিও মরে পড়ে আছে ! শুধু শুয়োরের মাংস আর বিন্ ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না, তাই দিয়ে আমরা খেয়ে নিলাম সবাই।

·
·

এখন আমরা রণ-স্থলের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ক্রোজাট খালের ওপর দিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করলুম আমরা। ক্রিগ্নির চৌমাথার কাছে বন্দুক সাজিয়ে রাখলাম। রাস্তার ওদিক থেকে ৪০।৫০ জনের একটা দল এসে হাজির হলো—আমরা তৈরী ছিলাম, অগ্নিবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সকলেই নিহত হলো। রণাংগণের খুব নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মৃতদেহগুলি লুকোবার আর কোনো প্রয়োজন বোধ করলুম না। আমরা রাইফেল, বারুদ আর লুইস গানগুলি সংগ্রহ করে দক্ষিণ পূর্ব দিকে রওনা দিলাম।

একটা বনের ধারে গোলন্দাজদের একটা ব্যাটারী রয়েছে। পরিখার মধ্যে আমার অধীনে এখন ব্রিটিশ উর্দি বা গ্রেট কোট পরিহিত সশস্ত্র প্রায় একশো জন লোক রয়েছে। ব্যাটারীর কাছে এসে আমরা অতর্কিত আক্রমণ করে গোলন্দাজদের গুলি করে মারলাম। নিঃসন্দেহে একটা

হত্যা-লীলা সংঘটিত হলো। জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ আমরা এখানে এক ডজন রাইফেল ও কিছু পরিমাণ খাদ্য পেলাম।

ম্যাপ অনুযায়ী ক্রোজাট খালের দক্ষিণ পারে জুসি গ্রামের দুমাইল দক্ষিণ পূর্বদিকে একটা ছোট্ট জংগল আছে। এখানে এসে প্রত্যেকটী লোককে জার্মান পোষাক পরে নিতে বল্লাম। সত্যিকার রণস্থল এখানে, এখানে মৃত্যু বরণ যদি করতেই হয় তো সৈনিকের মতই করবো আমরা, গুপ্তচররূপে নয়।

এই বনের পূব দিকে এসে আমরা দেখতে পেলাম একটা হাউই জার ব্যাটারী পিছন থেকে আচম্কা আক্রান্ত হতেই ওরা হতভম্ব হয়ে গেল, দু একজন পালিয়ে গেল, বাকী সকলে আমাদের হাতে নিহত হলো। একটী মৃত সৈনিকের কাছ থেকে পাওয়া দূরবীনের সাহায্যে আমি দেখলাম সামান্য সংখ্যক বৃটিশ সৈনিক জুসি অধিকার করে রয়েছে। জুসির ওপর গোলা চালাবার হুকুম দিলাম। আর সংগে সংগে উত্তরে ও দক্ষিণ-পূবে জুসিক্যাগ্নি ও জুসি চ্যান্নি পথের ওপর পাহারার নির্দেশ দিলাম। সেদিকে বৃটিশ সৈন্যদের সংগে আমাদের দলের সংঘর্ষ হলো এবং আকস্মিক আক্রমণের জন্য ওরা ছত্রভংগ হয়ে পড়লো। আরো অনেকগুলো রাইফেল, গোলা এবং তিনটী মূল্যবান মেশিনগান পুরস্কার পেলাম।

এদিককার টিলা ও জুসি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণ আমার দখলে। সম্মুখের প্রসারিত রেলপথের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করতেই দৃষ্টি গোচর হলো একদল সৈন্য আমাদের দিকে আসছে। আমি অবিলম্বে অগ্নি-বর্ষণের হুকুম দিলাম। ইংরেজরাও গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু আমাদের সঠিক অবস্থিতি ঠাহর করতে না পারার জন্য সফল হলো না ওরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে লড়াই চল্ল, বোঝা গেল গোলাগুলির অভাব রয়েছে ওদের।

আমরা যখন পুরোমাত্রায় অগ্নিবৃষ্টি শুরু করলাম, ওরা ছত্রভংগ হয়ে গেল, আমরা জয়লাভ করলাম।

আমাদের কোম্পানীর সব চাইতে বুদ্ধিমান ও সাহসী কর্পোরাল কোয়েরকে বল্লাম, আধঘণ্টার মধ্যেই অন্ধকার হয়ে আসবে। খালের ওপারে আমাদের লোকেরা আছে বলে মনে হচ্ছে—তুমি জুসিতে মার্চ করে আমাদের লোকেদের সংগে যোগ স্থাপনা করবে।

সে বল্ল, আপনি ?

আমি ফিরে যাচ্ছি! কোয়ের চমকে উঠলো, তবু সত্যিকার সৈনিকের মত অশোভন কৌতূহল প্রকাশ করলো না। আমি উলফ্‌গ্যাংয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের পরিকল্পনা ও সাফল্যের মোটামুটি একটা বিবরণ লিখে কোয়েরকে দিলাম। তারপর প্রত্যেকের সংগে করমর্দন করে অভিবাদন জানালাম। এই ছোট্ট কোম্পানীর জন্য গর্ববোধ করতে লাগলুম। ব্রিটিশদের প্রায় ৫০০ সৈন্যকে আমরা হতাহত করেছি, দুটী গোলন্দাজ ব্যাটারী দখল করেছি। একটা ডাম্প ধ্বংস করে দিয়েছি, ফ্রন্টের একাংশ শত্রু কবলমুক্ত করেছি আর আমাদের কোম্পানীর হতাহতের সংখ্যা বাদ দিয়েও প্রায় দেড়শো জার্মান সৈন্যকে তাদের কমরেডদের কাছে ফিরে যেতে সাহায্য করেছি।

নেস্‌লের কাছে আমার ডেম্‌লারটী ভাঙ্‌বার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। আটচল্লিশটী উত্তেজনাময় ঘণ্টা। আমি জানি আমার ফিরে যাবার কোনো বাধা নেই। বনের ধারে ঘোড়া ছিল আর ছিল লালটুপি—নিহত সামরিক পুলিশের। দ্রুতবেগে ঘোড়া ছোটালাম। ব্যোমোণ্টের পাকা রাস্তায় একজন সিগনাল ডেসপ্যাচ-রাইডার আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বলতে পারেন ৪৮তম ডিভিশনের হেড-কোয়ার্টার্স কোথায় গেল ?

আমি কোনো ·জবাব না দিয়ে উত্তেজনাভরে তাকে গুলি করে বসলাম। ধরা পড়বার একটা আশংকা ক্ষণেকের জন্য বিচলিত করেছিল আমাকে। ওর মোটর-বাইকটাও আমার প্রয়োজন ছিল। বাইকটা নিয়ে সারারাত চালিয়ে শনিবার সকালে—২৩ তারিখে এসে পৌছালাম। আমাদের হেড্-কোয়ার্টার্স ইতিমধ্যে ডিলার্স ব্রিটেনক্ষয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে।

আমি যখন সেখানে পৌছলাম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিগসন তখন সবেমাত্র টুপি পরছেন। আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, গ্রীন! কি সৌভাগ্য! তুমি সেরে গেছো?

আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, হ্যাঁ স্যর। কয়েকটা আঁচড় লেগেছিল। এখন আমি ডিউটির জন্যে তৈরী। আপনি কি অন্য গাড়ী পেয়েছেন?

হ্যাঁ, আমার নোতুন ড্রাইভারটাও বিমান-বিধ্বংসী গোলার টুকরোয় আহত হয়েছে কাল। তোমাকে পেয়ে খুসী হয়েছি। বাইরে গাড়ীটা দেখতে পাবে—আরেকটা ডেমলার। গিয়ে ষ্টার্ট দাও।

এপ্রিলের প্রথমভাগে ফিগসনের ওপর নূতন দায়িত্ব এসে পড়লো। আমরা আবার উত্তরে ফিরে গেলাম। প্রথম আমরা থামলাম মারভিলে। এখানে এসেই জুলার সংগে দেখা করার জন্য আমিয়েঁনে গেলাম। তাকে বল্লাম তার পুরোনো পেশা নিয়ে বেথুনে ফিরে আসতে।

এই দিককার ফ্রন্টে এসে ব্রিটিশদের ভবিষ্যৎ আক্রমণের সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলাম। পোর্তগীজ আর্মি কোর এলাকার প্রান্তে আমরা এখন অবস্থান করছি। পোর্তুগীজদের জোর করে যুদ্ধের মধ্যে টেনে এনেছে ব্রিটিশরা। কিন্তু কয়েকমাস ধরে দেখা যাচ্ছে তাদের মনোবল ভেঙে পড়ছে। দক্ষিণের কোন জাতিই দীর্ঘকাল আধুনিক যুদ্ধ সহ্য করবার উপযুক্ত নয়। সৈন্যরা দলত্যাগ করে মাঝে মাঝে। বিদ্রোহও ঘটেছে

কবার। তাই বিশ্বাসের অযোগ্য সৈন্যদলগুলিকে অপসারণ করাই সাব্যস্ত হয়েছে। ব্রিটিশ আর্মি কম্যাণ্ডার হর্ন অদ্ভুত নিয়মে সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছেন। প্রথমে একটা ডিভিশন সরিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনের ওপব ভার দেওয়া হচ্ছে গোটা ফ্রন্টের দায়িত্ব। ৬ই এপ্রিল আমি জানতে পারি : ৯ তারিখের রাত্রে ডিভিশন সরানো হবে। এর আগে আক্রান্ত হলে তা সোজাসুজি ভেঙে পড়বারই সম্ভাবনা।

বেথুনেব সেই হোটেলে কাউণ্টাবের মেয়েটা আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলো। আজকাল ব্যবসা মন্দা চল্‌ছে—বেথুন আর আগেকাব মত ফ্রন্টের পেছনে সেই শান্তিময় অঞ্চল নয়। যখন তখন বোমা পড়ে এখানকার খুব ক্ষতি হয়েছে, অনেক লোকও মারা পড়েছে। মেলাই সৈন্য এখানে থাকলেও মেয়েরা আব থাকতে বাজী হয় না। জুলাকে আসতে দেখে মেয়েটা খুশীই হয়েছিল।

ঘণ্টাখানেক ধরে জুলা ও আমি বসে বসে শুধু নখ চিবোতে লাগলুম। ফ্রন্টের খবরটা কি উপায়ে পাঠানো যায় ভাবছিলুম আমরা। সাধারণ চিঠির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বার্তা আজকাল প্রায়ই ধবা পড়ছে। এমব্রয়ডারী সংগীত এসব পদ্ধতি এখন বহু ব্যবহৃত সেন্সব কর্তাবা এগুলোব প্রতি সর্বাগ্রে নজব দিচ্ছে। কোনিন? না, সে এনেকিউন ছেড়ে গেছে। ২নং খনি ব্রিটিশরা বন্ধ কবে দিয়েছে। অবশেষে উপায় হলো একটা—জুলা প্যারীর ট্রেনে চলে গেল। সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডে তার 'মাসী'র কাছে টেলিগ্রাম পাঠালো : জর্জ ৯ তারিখের রাত্রে যাত্রা করবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পাবো?

জার্মানরা ৯ তারিখের বাত্রে পোর্তুগীজ ফ্রন্টে আক্রমণ চালিয়ে ওদের ছত্রভংগ করে দিয়েছিল। আমাব পাঠানো খবরের ফলেই জার্মানরা সেদিন বিজয় লাভ করেছে—এই গর্ব আমাব মনে ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে

জার্মানীতে উলফ্‌গ্যাংয়ের সংগে আলোচনার সময় জেনেছিলাম এর কৃতিত্ব একটুও আমাদের প্রাপ্য ছিল না, কারণ টেলিগ্রামটা জেনেভায় পৌছেছিল ৯, ৪, ১৮ তারিখের ১০টার সময়। তার আগেই জার্মান পক্ষ আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল!

১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মের শুরুতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছিল সমগ্র ইউরোপ। ব্যাধির প্রকোপে এক একটা গোটা ব্যাটালিয়ানই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। আমাদের ষ্টাফের অর্ধেকেই ছিল সে সময়ে শয্যাশায়ী। ফ্রন্টে বিরাজ করতো নিস্তব্ধতা। লোকের অভাবে হেড কোয়ার্টাসে কাজের চাপ অসম্ভব। প্রাত্যহিক রুটিন অর্ডারের প্রতি ঠিকমত নজর দিতে পারতুম না। অবসরমত একদিন যখন সেদিকে নজর দিতে গেলাম, হঠাৎ একটী বিজ্ঞপ্তি পড়ে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল :

তৃতীয় ক্যাভালরি ডিভিশনের এসিষ্ট্যাণ্ট প্রোভষ্ট মার্শাল * আর্মি সার্ভিস কোরের মোটর ড্রাইভার বলিয়া অনুমিত কোনো এক কর্পোরাল গ্রেনের সন্ধানের জন্য উদ্বিগ্ন। সন্ধান পাওয়া মাত্রই লোকটীকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

কর্পোরাল গ্রেন! আমার সত্যিকার নামটাই ভুলে গিয়েছিলাম। ৩য় ক্যাভাল্‌রি ডিভিশন—ক্যানেডিয়ান ক্যাভাল্‌রি ব্রিগেড ঐ ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত। মিডোজ ঐ ব্রিগেডেরই অফিসার। "গুরুতর আহত" হয়েছিল দুবছর আগে। কিন্তু গুরুতর আহত লোকেরাও যে যথাসময়ে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে তা আমার জানা বা ভাবা উচিত ছিল। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপজ্জনক।

স্নায়বিক দুর্বলতা বোধ করি। অফিস ষ্টাফের ভারপ্রাপ্ত সার্জেণ্ট-

* **সামরিক পুলিশের কর্তা**

মেজর আরো দুর্বল করে দেয় এসে। সে বল্লে, এটা দেখেছ গ্রীন? একটা হরফের তফাৎ, নইলে তোমার হাতেই শেকল ঝুলিয়ে দিতাম।

কোনো জবাবই দিতে পারলুম না। শুধু বলি ইনফ্লুয়েঞ্জা আমাকেও স্পর্শ করেছে। পরের দিন ফিগসন শয্যাশায়ী হলেন জ্বরে—জ্বরের তাড়না এত বেশী হয়ে উঠলো যে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো।

এইবারই আমি সত্যিকার ভয় পেলাম। মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো আমরা এখানে এসেছি। এরা আমাকে ভালো করে চেনে না। বিপদ ঘটলে একমাত্র ফিগসনই আমাকে রক্ষা করতে পারতেন, আমার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সন্দেহ তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারতেন।

ফ্লু আমাকেও কাবু করলো। তিন দিন শয্যার উপর আচ্ছন্নের মত পড়েছিলাম। একজন মেডিক্যাল অর্ডারলি রোজ একবার করে আমাকে দেখে যেতো। আমি বিশ্রীরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ব্যাধি আমাকে দুর্বল করেছে, তার ওপর মনেও ছিল আমার আতংক।

তৃতীয় দিন সার্জেণ্ট-মেজর এসে বল্লে, গ্রীন, আমি দুঃখিত যে তোমাকে অসুস্থ অবস্থায় বিরক্ত করতে হচ্ছে, কিন্তু গুটিকয়েক কথা সার্জেণ্ট নিকলসের সংগে বলবে কি?

দেখতে পেলাম নিকলসের মাথায় লালটুপি *। সে বল্লে, দুঃখিত কর্পোরাল, কিন্তু ব্যাপারটা জরুরী। ১৯১৬ সালে তুমি কি আমিয়েঁনে ছিলে?

জবাব দিলুম, হ্যাঁ। ১৯১৬ সালে জেনারেল ফিগসন ফোর্থ আর্মির হেড-কোয়ার্টার্সে ছিলেন জানেন বোধ হয়।

---

* সামরিক পুলিশের টুপি

ঠিক। কর্পোরাল গ্রেন নামে কোনো মোটর ড্রাইভারের সংগে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ?

আমি জবাব দিলুম, না, তার কথা আগে শুনি নি।

লালটুপি বলতে লাগলো, প্রায় ৫ ফিট ১০; বয়স ২৮য়ের কাছাকাছি। মজবুত গড়ন চেহারা, কটা চুল। নীল চোখ। জার্মান ভাষা অনর্গল বলতে পারে।

আমি বল্লাম, বর্ণনাগুলো অনেকের সংগেই মিলে যাবে—আমার সংগেও মিলতে পারে, শুধু যা আমি জার্মান জানি না।

ও! একটা কূট মতলব খেলে গেলো তার মাথায়: sprackens zie deutsch ?

জ্বরের তাড়নায় আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমিও জার্মান ভাষায় জবাব দিলাম, Bon soir qui mal y pense.

সার্জেণ্ট নিকলস্ বল্লে, আমি হতাশ হলুম না, কারণ কোনো আশা নিয়েও আমি আসি নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি ?

সে সহজ গলায় বল্লে, সন্দেহ হচ্ছে এই গ্রেন লোকটা জার্মানীর গুপ্তচর। ওর নামটা রেকর্ডে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ১৯১৬ সালে ওকে দেখা গেছে আমিয়েঁনে। ফ্রান্সের সমস্ত আর্মি সার্ভিস কোর-ওয়ালাদের মধ্যে সন্ধান করলে ও ধরা পড়বে নিশ্চয়ই। তাছাড়া দুজন ক্যানেডিয়ান অফিসার ওকে দেখামাত্রই চিনতে পারবে। সুতরাং—

কোনো সংশয় আর রইলো না আমার। অসম্ভব রকম ভীত হয়ে পড়ছি আমি। সেই ৪৮ ঘণ্টার বীরত্বপূর্ণ অভিযানের পর কেন আমি চলে গেলাম না ফ্রণ্টের ওপারে ? উলফ্গ্যাং জানিয়েছিল ওই ঘটনার পুরস্কার স্বরূপ আমার গুপ্তচর হিসাবে আর কাজ না করলেও

চলবে। ইতিমধ্যে নাকি আমার নামে সম্রাটের আয়রন-ক্রসের সুপারিশও করা হয়েছে।

দুদিন পরে একটু সুস্থ হলে আমি বেথুনে এসে জুলার সংগে দেখা করলাম। সমস্ত কথা খুলে বল্লাম ওকে। জুলাও ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছে দেখতে পেলাম। ওর স্বর দুর্বল, তবু ওকে আমার চেয়ে সবল মনে হলো। বল্লে, যুদ্ধটা বড্ড বেশী স্থায়ী হচ্ছে। আমার পক্ষে যথেষ্ট করা হয়েছে। তবু সব ব্যর্থ।

ব্যর্থ ?

হ্যাঁ, জার্মানরা যখন নোতুন পোল্যাণ্ডের কথা বলেছিল, তখন কত আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সেটা হবে জার্মান পোল্যাণ্ড। তোমাদের লোকেরা পিলসুডিস্কিকে জেলে পাঠিয়েছে জানো ?

কি ?

হ্যাঁ, কয়েকমাস আগে। সবেমাত্র খবরটা শুনেছি, আর শোনা থেকেই জার্মানদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ঠিক করেছি আর এ কাজ করবো না। তবে তোমাকে আমি সাহায্য করবো লুই, তুমি অবিলম্বে জার্মানীতে পালাও—ইংরেজরা বিপজ্জনক।

তুমিও আমার সংগে চলো।

একলা যাওয়াই তোমার সুবিধা। তোমার জন্যে আমি একপ্রস্থ বেসামরিক পোষাক কিনে আনছি এক্ষুনি। আর একটা জাল-পাশ।

অসুস্থ শরীরেও সে আমার জন্য পরিশ্রম করলো। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে আমার জন্যে পুরো একপ্রস্থ পোষাক কিনে নিয়ে এলো। সেগুলো পরে নিলে সে বল্লে, ফটোগ্রাফারের দোকান থেকে পাশপোর্ট সাইজের একটা ছবি তুলে নাও। তারপর এখানে এসে অপেক্ষা করো।

দুঘণ্টা পরে জুলা তার ঘরে ফিরে এলো। একটা ভাঁজকরা কাগজ বার করে দিল আমার হাতে। সেটা হচ্ছে বেথুনের এঞ্জিনিয়ার ফ্রাংকোয়া বোকিলোঁর পরিচিতি-পত্র। সেটা থেকে তার ফটোটা তুলে নিয়ে সে জায়গায় আমার ফটোটা এঁটে দিয়ে ক্রমাগত ফটোটাকে ঘষতে লাগলো সে, যতক্ষণ না ছবিটা জীর্ণ কাগজটার মতই জীর্ণ হয়ে আসে।

জুলা বল্লে, এখন তুমি প্যারীর যাত্রী একজন ফ্রেঞ্চম্যান। কিন্তু প্যারী যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। তোমার তো কেমিষ্ট্রি-জ্ঞান আছে অর্থাৎ কালির ব্যাপার—

আমি জানালুম আছে। জুলা তখন বল্ল, ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যে আমার কাছে একজন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন আছে। ডাক্তারের সইটা বাদ দিয়ে আর সব লেখাগুলো মুছে তুলে দিতে পারবে?

পারবো। একটু সালফিউরিক এ্যাসিড আর কিছু এ্যামোনিয়া দরকার। কিন্তু তাতে কি হবে?

জুলা জানালো, ডাক্তারের ছাপানো নাম ঠিকানা আর তার স্বাক্ষরের মধ্যখানের জায়গাটায় কোনো একটা প্যারীর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যদি টাইপ করে দেওয়া যায় এই বলে যে মারাত্মক ধরণের টি. বি'র সন্দেহে তোমাকে অবিলম্বে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে, তাহলে কোনো পুলিশই তোমাকে আটকাতে পারবে না।

আসন্ন অন্ধকারের প্রত্যাশায় আমরা বসে রইলাম। কিছুক্ষণ আমরা নীরব ছিলাম। তারপর কথা কইতে সুরু করলাম। আমাদের ব্যর্থতা ও সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা চল্ল। একসময় বাইরে গাড়ীটা থেকে জুলা আমার গ্রেট কোট এনে দিল। আমিয়েঁন পর্যন্ত গাড়ীতে যাবো, তারপর শহরের বাইরে কোনো জায়গায় গাড়ীটা পরিত্যাগ করে সাধারণ নাগরিকের মত ট্রেন ধরবো। সংগে একশো ফ্রাংক আছে।

জুলা স্মরণ করিয়ে দিলে প্যারীর বুলেভার্ড রাসপোলে সুইজারল্যাণ্ডের পাশপোর্ট পাওয়া যাবে।

যাত্রার সময় হয়ে এলো। তিন বছরের মধ্যে এই প্রথমই আমি ওর চোখে জল দেখলাম।

আমাকে তোমার মনে থাকবে লুই?

তোমাকে আমি ভুলবো না জুলা।

যুদ্ধের পরে এসে দেখা করবে তো?

নিশ্চয়ই।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম, কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না ওর কাছ থেকে। চুম্বন করার জন্য এগিয়ে যেতেই ও হাত বাড়িয়ে বাধা দিল। বল্ল, তোমার যাবার সময় হয়েছে লুই। খুব সাবধানে থেকো। কথাবার্তা কইতে যেও না কারুর সংগে। প্যারী পৌছলে তবু অনেকটা রক্ষা। বিদায়, বিদায় লুই।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি পাছে ভাবপ্রবণতা আমাকে দুর্বল করে ফেলে। জানলায় দেখতে পাই না ওকে, জানি সে এখন শয্যার ওপর শুয়ে কেঁদে হৃদয়টা লঘু করবার চেষ্টা করছে।

আমিয়েঁনে এসে পৌছলাম ভোরের আগেই। তখনো অন্ধকার রয়েছে। সুবিধাজনক জায়গায় এনে গাড়ীটা থামালাম। তারপর পথের ধারের নালায় আমার গ্রেটকোট ও মিলিটারী টুপি ডুবিয়ে দিলাম। অল্পক্ষণ পরে ষ্টেশনে এসে প্যারীর ট্রেন ধরলাম।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারি নি, তাই আমার পক্ষে পীড়িত ব্যক্তির অভিনয় করা কঠিন হয় নি। ষ্টেশনে ওয়েটিং-রুমে একজন পুলিশ আমার কাগজপত্র দেখতে চাইলো, কিন্তু পীড়িত দেখে সে সহানুভূতির সংগে ফেরৎ দিল। আমাদের কম্পার্টমেণ্টে সকলেই গল্প-

গুঞ্জবে মত্ত ছিল। আমার পাশের লোকটি আমার সংগে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতেই আমি সেই চিঠিখানা দেখাতেই সে চুপ করে গেল আর আমার ছোঁয়াচ থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বেথুন ছাড়ার সময় আমি আমাদের সার্জেণ্ট-মেজরের উদ্দেশ্যে একটা চোক পাঠিয়েছিলাম : হাসপাতালে যাচ্ছি। বিশ্রী অসুস্থ বোধ করছি। এল. গ্রীন, কর্পোরাল। কোনো ঠিকানা দিই নি। উদ্দেশ্য আমার সম্বন্ধে ওদের সন্ধানকার্য অন্তত দুটো দিনের জন্যেও স্থগিত থাকবে। দুটো দিনের সময় আমি পাবো।

আমার কাগজপত্র ঠিক আছে, কিন্তু ফরাসী ভাষা আমার নির্ভুল নয়, অন্তত একটানা জেরা টিকে থাকবার মত নয়। তাই প্যারীতে পৌঁছবার পর আমি বুলেভার্ড রাসপোলে আমাদের জানা লোকটীর দোকানে এসে উপস্থিত হলাম। একটা চশমা পরা লোককে টেবিলের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, মঁ অবিগ্নি আপনার নাম ?

সে ঘাড় নেড়ে জানাতেই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারই নাম অবিগ্নি ?

হ্যাঁ, কি দরকার বলুন দেখি। বিরক্তির সংগে বল্ল সে।

একটা পেন্সিলে তার টেবিলের ওপর লিখলাম, এ. এফ. ১৮৯ (গুপ্তচরের নম্বর)। লোকটা তাড়াতাড়ি আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি চান বলুন তো ?

—সুইজারল্যাণ্ডে যাবার একটা পাশপোর্ট চাই এখুনি—অবিলম্বে।

—ও ! জাতীয়তা হিসাবে কোন্‌টা রাখা হবে ?

—কোন্ কোন্ জাতীয়তা করতে পারেন আপনি ?

—এখুনি চাইলে ফরাসী কিম্বা আমেরিকান করতে হবে। তার

নিস্পৃহতা দেখে মনে হলো ভূয়া ছাড়পত্র তৈরী করা যেন ওর পক্ষে কিছুই নয়।

ফরাসীর চাইতে আমেরিকানই আমার পক্ষে বেশী সুবিধা। আমি তা জানাতেই সে কতকগুলি বিবরণী জানতে চাইলো। আমি ওকে আমার সমবয়স্ক শিকাগোর খ্যাতনামা একজনের নাম বল্লাম। স্বাস্থ্যের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাচ্ছি। তার পারিবারিক বিবরণী যা দিলাম তা যুক্তিসংগত-ভাবে নির্ভুল।

ফটো তৈরিই আছে। লোকটা কাল সকালে পাশপোর্ট দেবে বল্ল। আমি বল্লাম, এখুনি চাই, নয়তো অপেক্ষা করছি যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়।

অবশেষে লোকটা একটা ছাপানো পাশপোর্টের ফর্ম বার করে দেখালো। আমি দেখলাম সেটা হুবহু আসলের মতই। সে বল্লে, জার্মানীতে এগুলো ছাপা হচ্ছে।

টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠার আগে কেরাণীটা পাশপোর্ট দেখতে চাইলে আমি সেটা উল্টো করে দেখালাম। তাতেই লোকটা সন্তুষ্ট হলো। তার কাজ হচ্ছে শুধু দেখা যে যাত্রীরা পাশপোর্ট সংগে নিয়ে আসতে ভোলে নি।

ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টের একটা কোণ দখল করে বসলাম। টাইম টেবলটা দেখে নিলুম—আর বারো ঘণ্টার মধ্যেই সুইজারল্যাণ্ডে পৌছাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে এলো একজন টিকেট-চেকার, তার সংগে সংগে আর একজন প্রহরী। প্রহরীটা সমস্ত পাশপোর্টগুলো চেয়ে নিয়ে দেখতে লাগলো আলোর কাছে গিয়ে। আমারটা পরীক্ষা করতে যেন একটু বেশী সময়ই নিলো, তারপর অবশ্য ফেরৎ দিয়ে চলে গেল।

আর দশটা ঘণ্টা! ফ্রান্স থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডে পৌছবো। আটচল্লিশ ঘণ্টা! আমার জীবনের গতি-প্রকৃতির কথা

ভাবতে লাগলাম বসে বসে। মিউনিকে অ্যানার সংগে ঘনিষ্ঠ হবার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমার জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল; সোমে আমি সাহসিকতাপূর্ণ লড়াই করেছিলাম আটচল্লিশটা ঘণ্টায়। আর এখন মাত্র দশটা ঘণ্টা আছে, তারো কম—

ডিজনের কাছাকাছি সেই প্রহরীটা ও একজন সাধারণ পোষাকপরা কর্মচারী আমার পাশপোর্টটা আরেকবার চাইলো। আমি বার করে দিতেই কর্মচারীটা সেটা লুফে নিল। ভাল করে পরীক্ষা করে বল্লে, আমি দুঃখিত আপনি আমার সংগে আসুন।

গভীর অন্ধকার খাদে যেন পড়ে যাচ্ছি। কপালে জমে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘাম। তবু বাইরে উষ্ণতা প্রকাশ করে বল্লুম: এ রকম বিরক্ত করার অর্থ কি?—

—হয়তো সবই ঠিক তবু আজকালকার দিনে ভালো করে দেখে খুশি না হওয়া পর্যন্ত—

ডিজনে গাড়ী থামতেই ওরা আমাকে সেখানে নামিয়ে দিল। প্রতিবাদ জানিয়ে কোনো ফল পেলাম না। প্যারীর ফিরতি-ট্রেনে আমাকে তুলে দিল ওরা। প্যারীতে পুলিশ-ষ্টেশনে আমাকে নিয়ে আসা হলো।

ঘণ্টাখানেক একটা সেলের মধ্যে আটক ছিলাম। তারপর সেই সাধারণ পোষাকপরা লোকটা আমাকে সম্বোধন করে বল্ল, ফ্রিৎজ্ রাইখহ্বের, ওরফে জঁা দিভর, শত্রুর গুপ্তচর সন্দেহে আর ৩০শে জুন ক্লারমণ্ট ফেরাণ্ডের গুলির কারখানায় নাশকতামূলক কাজের অভিযোগে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।

মূর্খ! আমি চীৎকার করে উঠলাম, আমি রাইখহ্বের বা দিভর কেউ নই। ৩০শে জুন ক্লারমণ্ট ফেরাণ্ডের ধারে কাছে কোথায় ছিলুম না।

ভালো কথা; তবে সেদিন কোথায় ছিলে ?

জবাবটা আমি দিতে পারলুম না। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম আমি যেন নিজের জীবনের জন্য যুদ্ধ করতে শুরু করেছি।

ইন্সপেক্টর ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, আমি কোনো জবাব না দিয়ে শুধু একটীমাত্র দাবী তুলছিলাম : আমেরিকান কন্‌সালকে চাই। ১৯১৬ সালে, তখনকার দিনে, ফ্রান্সে আমেরিকার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

আমেরিকার দূতাবাস থেকে বিকেলে একজন এলেন, ধীর বিজ্ঞজনোচিত চেহারা। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমেরিকার নাগরিক ?

হ্যাঁ, আপনি এসেছেন বলে আনন্দিত।

নাম কি তোমার ?

আমি শিকাগো শহরের উল্লেখ করে আমার পাশপোর্টে উল্লিখিত নামটাই বল্লাম, পিতার নামও বল্লাম। বলা বাহুল্য, যে নাম আমার নিজের বলে চালাচ্ছি, সেটা সত্যিকার একজন আমেরিকানের নাম, তার পিতা একজন সেনেটর।

ভদ্রলোক বল্লেন, তোমার পিতাকে আমি জানি। কিন্তু তুমি যে তাঁর ছেলে সেটা ঠিকতো ?

তা নয় তো কি ? আর কি হতে পারি ?

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বল্লেন, জানি না। তবে ছেলেটী ছয় সপ্তাহ আগে লড়াইতে মারা গেছে !

হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মিথ্যা পরিচয় নিঃসন্দেহে আমাকে নির্বোধ প্রমাণিত করেছে। ভদ্রলোক বল্লেন, তোমার কথা শুনে আজ সকালে ওর রেজিমেণ্টের কর্ণেলের সংগে দেখা করে খোঁজ নিয়েছিলাম। এবিষয়ে কোনো ভুলই নেই যে সে মারা গেছে আর তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

অতএব, আমার সাহায্য যদি তোমাকে নিতেই হয় তো সোজা সত্য কথা বলো।

অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের জন্য ধিক্কার দিলাম নিজেকে। তবু সাহসের সংগে আমি শিকাগো শহর, সেখানকার সুপরিচিত ব্যক্তিদের নামধাম ইত্যাদি বর্ণনা করতে লাগলুম। ইউনিভার্সিটি ও প্রফেসরদের সম্বন্ধে, সেখানকার পথঘাট ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি বলতে লাগলাম।

রাষ্ট্রদূত জবাব দিলেন, এতে প্রমাণ হচ্ছে শিকাগো তোমার পরিচিত। কিন্তু তুমি যে আমেরিকার নাগরিক তা প্রমাণ হয় না।

আমি বল্লাম, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি ?

গত জুন মাসে একজন লোক ক্লারমণ্ট ফেরাণ্ডে এসে সেখানকার কেমিষ্টের সংগে আলাপ জমিয়ে পাওয়ার-হাউসে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অন্তর্হিত হয়েছিল।

আমি বিস্মিত হয়ে বল্লাম, তার সংগে আমার কোনো সংস্রব নেই। সেখানে আমি কখনো যাই নি।

সেটা প্রমাণ করতে পারলে ভালোই। তাছাড়া তোমার পাশপোর্টের ব্যাপারটা রয়েছে। ওটা —'র পাশপোর্ট নয়। তা ছাড়া সে ছিল সৈনিক, পাশপোর্টের দরকারই ছিল না তার। আর এখন সে মৃত। আরো একটা অভিযোগ হচ্ছে পাশপোর্টটা আদৌ আমেরিকান নয়। ওটা জাল ছাড়পত্র।

জাল !

হ্যাঁ, তোমার পাশপোর্টে আমেরিকান ঈগলের নখের থাবা ভুল দিকে বাঁকানো আর লেজে দুটো পালক কম।

পরের দিন একটা লোক আমাকে সনাক্ত করে গেল এই মর্মে যে ক্লারমণ্ট ফেরাণ্ডের নাশকতা কার্যের অপরাধী ব্যক্তি আমিই। আমি

নিঃসন্দেহ ছিলাম যে ও কাজটা যখন অপর ব্যক্তির দ্বারা ঘটেছে, তখন আমাকে অপরাধী বলে প্রমাণ করানো যাবে না। কিন্তু মিথ্যা সনাক্তি-করণ আমার বিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করে দিল।

ফরাসী গুপ্তচর বিভাগের লোকেরা ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের অফিস থেকে আমাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করা হচ্ছিল। · এক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ৩০শে জুন কোথায় ছিলে তুমি ?

আমি বল্লুম, পাশপোর্ট দেখে বলতে পারি। বোধহয় তখন সমুদ্রে।

পাশপোর্ট জাল, ও থেকে কি আসে যায় ? কোন জাহাজে ছিলে তুমি ?

আমি আচমকা বলে বসি, লরেন্টিক।

লোকটি বেরিয়ে যায়। দুমিনিট পরে এসে বলে, লরেন্টিক যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, গত তিন মাসের মধ্যে কোন সাধারণ যাত্রী বহন করেনি।

আমার সব আন্দাজগুলিই নিস্ফল প্রতিপন্ন হচ্ছে। নিশ্চিতভাবে দুর্ভাগ্য আমাকে চরম বিচারের সম্মুখীন করেছে।

তবু ক্ষীণতম আশা ছিল এই যে এরা আমার সত্যকার পরিচয় জানে না। কে এক জঁা দিভর ওরফে ফ্রিৎস্ রাইথহেবের সন্দেহে আমাকে অভিযুক্ত করেছে—সামরিক আদালতে নিশ্চয়ই আমি ঐ পরিচয়ে অভিযুক্ত হতে পারি না।

কিন্তু বিচারের সময় আমার সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে গেল। প্রসি-কিউটর বল্লেন, এই লোকটি যে ৩০শে জুন ক্লারমণ্ট-ফেরাণ্ডে গুরুতর নাশকতামূলক কার্য সম্পন্ন করেছে সে বিষয়ে আদালতের কাছে প্রমাণ রয়েছে। ঐ একটা অপরাধের জন্যই তার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য। এছাড়া সে যে শত্রুর গুপ্তচর তাও আমি প্রমাণ করবো, ওর নাম হচ্ছে ফ্রিৎজ রাইথহেবের।

: কেমিষ্ট মার্টিগ্নির বিবৃতি থেকে জানা যায় তার ছেলের সঙ্গে এই লোকটার ঘনিষ্ঠতা ছিল। মার্টিগ্নির ছেলে জেনারেল মানগিনের ষ্টাফের অফিসারদের অন্যতম, কিছুদিন থেকে সে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করে আসছিল। ওর একজন কেরানী ছুটিতে গিয়ে ফেরেনি। একদিন তার নামে একটা পার্শেল আসতে সে না থাকায় অন্যান্য কমরেডরা সেটা খুলতেই দেখতে পায় একটা কেক, তার মধ্যে একটা অদৃশ্য কালির শিশি লুকোনো ছিল। আর সংগে একটা টোকও ছিল, যেটা থেকে জানা যায় লোকটা জার্মানদের এজেন্ট, যাকে আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজে আসছি।

আমি চীৎকার করে উঠি : ওই টোকটা আমি দেখতে চাই।

ইনটেলিজেন্স অফিসার অতি সাবধানে সেটা আমায় দেখালেন। আমি সেটা পড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বল্লাম, এটা মোটেই আপত্তিকর নয়। সাধারণ জন্মদিনের অভিনন্দন !

অফিসার বল্লেন, তাহলে ওটা পড়তে পেরেছো দেখছি। আমরা শুনেছিলাম তুমি ফরাসী জানো না।

আবার আমি ভুল করলাম। ফ্রিৎস রাইখহ্বেরের বিচারে আমার একেবারে নির্বাক হয়ে থাকাই যুক্তিসংগত ছিল। অফিসারটি কাগজটার ওপর গরম ইস্ত্রি বুলিয়ে দিতেই অদৃশ্য কালিতে লেখা এই কথাগুলো ফুটে উঠলো : অবিলম্বে রিপোর্ট দাও—পাল্টা আক্রমণ আসন্ন কি না।

জাঁ দিভর ওরফে রাইখহ্বেরের বিরুদ্ধে অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি শোনাবার পর পাশপোর্টের ব্যাপার উঠলো। স্পষ্টত দেখলুম আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য কাউকে বিশ্বাস করাতে পাচ্ছি না যে সত্যিই আমি জাঁ দিভর নই।

কোর্টের প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাহলে কে ?

আমি একজন আমেরিকান নাগরিক।

প্রেসিডেন্ট ব্যংগের হাসি হেসে বল্লেন, আমেরিকান কনসালকে তা বিশ্বাস করাতে পারো নি, অথচ আশা করো কোর্ট সেটা বিশ্বাস করবে! জাল পাশপোর্ট সম্বন্ধে তোমার কি ব্যক্তব্য থাকতে পারে ?

আমার নিজেরপাশপোর্ট চুরি হয়ে গিয়ে থাকবে—

যুক্তিটা নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিহত ঐ সং সৈনিকটার নাম ব্যবহার করার পক্ষে যথোচিত নয়। ৩০শে জুন ক্লারমণ্ট ফেরাণ্ডে না গিয়ে থাকলে সেদিন কোথায় ছিলে ?

আমাকে নীরব থাকতে দেখে প্রেসিডেন্ট বল্লেন, তোমার বিরুদ্ধে অভি-যোগ প্রমাণের পক্ষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিই যথেষ্ট। যথা, ফরাসী ভাষায় অজ্ঞতা জানানো সত্ত্বেও ফরাসী ভাষা পড়তে পারা ; ভূয়া ছাড়পত্র কাছে রাখা, আমরা জানি তাদের জার্মানীতে গুপ্তচরদের ব্যবহারের জন্য ঐরকম ছাড়পত্র ছাপা হচ্ছে। আর ৩০শে জুন কোথায় ছিলে তা জানাতে না পারা।

কোর্টের কাজ স্থগিত রাখা হলো মিনিট দশেকের জন্য। তারপর প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় শাস্তি দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড—কাল প্রত্যূষে তোমাকে গুলি করে মারা হবে—

ভিন্‌সেনের কারাগারে নিয়ে এলো আমাকে। পুলিশসেলের জঘন্য পরিবেশের চাইতে এখানকার ঘরটা অন্তত ভালো। পালাবার কথা ভাবলুম একবার। কিন্তু সে চিন্তা ত্যাগ করতে হলো। পালানো অসম্ভব। একটু পরেই গোয়েন্দাবিভাগের লোক এসে জ্বালাতন করতে শুরু করলো। লোকটা আমার মুখ থেকে স্বীকারোক্তি বার করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করতে লাগলো : কে আমি, প্যারীতে জার্মানদের কোন্ কোন্ গুপ্তচর আছে, কারা আমার সহকর্মী ? খবরগুলো দিলে নাকি আমার মৃত্যুদণ্ড মকুব হতে পারে। আমি কোনো জবাব না দিয়ে পিছু ফিরে বসেছিলাম।

জীবনের শেষতম রাত্রি কালো পাখা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে। গ্রীষ্মের দীর্ঘ সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে এলো। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না মৃত্যু এত নিকটে। বাইরে করিডরে দুটো সোয়ালো অনবরত কিচির-মিচির করে আমাকে বিদ্রূপ করছিল। হঠাৎ তালা খোলার শব্দ পাই। পাদ্রী এসে ঘরে ঢোকে। আমি চীৎকার করে উঠি, বেরিয়ে যাও।

সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ধীরস্বরে পাদ্রী বল্লেন, তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি বৎস। সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ। আমি এনেছি তোমার জন্য শান্তি।

—ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই।

দোয়াত, কলম ও কালি এনে দিলেন পাদ্রীটি। বল্লেন, তোমার দরকার হতে পারে।

কৃতজ্ঞ হলাম ওর প্রতি। চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল।

তিনটি চিঠি লিখলাম। লিখলাম জুলাকে, উলফগ্যাং হেরিংজেনকে, আর জার্মানীতে প্রত্যাগত আমার মামাকে।

তখনো বাইরে অন্ধকার রয়েছে, প্রভাতের অনেক বাকী। একজন কর্ণেল তালা খুলে আমার কক্ষে প্রবেশ করলো। আমি শান্তভাবে বল্লাম, সুপ্রভাত। আমি প্রস্তুত—

কর্ণেল হাতের কাগজপত্রের দিকে একবার চেয়ে জানালো, আপনার চরম দণ্ড আজ স্থগিত রাখা হয়েছে। কোর্টের রায় নাকচ করা হয়েছে।

কেন, অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম।

ফ্রিংজ রাইথহ্বের লোকটা মার্সেল্‌সে ধরা পড়েছে। তার নিজের স্বীকারোক্তিও পাওয়া গেছে।

আমি নির্দোষ তা আগেই বলেছি। তাহলে আমি এখন মুক্ত ?

না, দৃঢ়স্বরে জানালো কর্ণেল, শুধু মৃত্যুর হুকুমটা রদ করা হয়েছে, জাল পাশপোর্টের বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করা হবে।

লোকটা টেবিলের দিকে চেয়ে দেখছে, দোয়াত, কলম, কালি ! তিনটে চিঠি আমার পকেটে রয়েছে। ঐগুলি আমাকে সনাক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। বল্লুম, কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে দেওয়া হোক আমাকে। মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, একটু শুয়ে থাকতে চাই—

দশটা মিনিট—চিঠিগুলো চিবিয়ে গিলে ফেলার পক্ষে অমূল্য সময়। লোকটা যেন আমার মনের কথা জানতে পেরেছে। হঠাৎ আমার প্রতিবাদ সত্বেও আমাকে তল্লাশী করে চিঠিগুলো কেড়ে নিলো। উলফ-গ্যাংয়ের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিটা পড়ে সে বলে উঠলো, হুঁম্, ইম্পিরিয়াল জার্মান আর্মির লেফটেন্যান্ট লুডহ্বিগ গ্রেন, চিঠিগুলো লেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ ! কর্পোরাল লুইস গ্রীনকে খুঁজে বেড়াবার পরিশ্রম থেকে বেঁচে গেল ব্রিটিশরা।

এক সপ্তাহ পরে ফরাসীরা ফেব বিচার শুরু করলো। এবার বিচার আরম্ভ হলো লুডহ্বিগ গ্রেনেব। বিচারের ভার ফরাসীদের হাতে থাকলেও ব্রিটিশরাও অংশ গ্রহণ করবে শুনে একটু আশা পেলাম।

প্রথম সাক্ষ্য নেওয়া হলো মিডোজের। সে আমার বাল্যকাল ও ইস্কুল জীবনের সমস্ত কথা বিবৃত করলে। আমিয়েঁনে দেখা হওয়ার কথাও বল্লে। আমার ছোটবেলার জার্মান স্বাজাত্য ও স্বদেশপ্রীতির কথা সে ভুলতে পারে নি। আহত হওয়ার পর যখন সে সুস্থ হয়ে উঠলো, তখন সে আমার সম্বন্ধে খোঁজ করে।

মিডোজ অবশ্য কোনো মিথ্যা বা কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত করে নি। সে যা জানতো তাই বলেছে। এরপর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চের

ইন্সপেক্টর সাক্ষ্য দিলেন। আমি অবাক হলাম ইংরেজ পুলিশদের কর্মতৎ-পরতায়। তিনি আমার ইংল্যাণ্ডে আসা. ইউনিভার্সিটিতে ঢোকা, স্থানীয় সমস্ত ব্যাপারে অংশ নেওয়ার কথা খুটিনাটি বলে জানালেন আমি ব্রিটিশ নাগরিক-সত্ব অর্জন করিনি।

প্রেসিডেন্টের জেরার উত্তরে আমি বল্লাম, সাক্ষ্যপ্রমাণাদিতে দেখা যাচ্ছে আমি জার্মান নাগরিক। সেটা অস্বীকার করবো না, তবে লড়াই না বাধলে জার্মান নাগরিক অধিকার ত্যাগ করে আমি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করবার চেষ্টা করতুম। লড়াই শুরু হলে উপায়ান্তর না দেখে আমি ব্রিটিশ সেনাদলে যোগ দিলাম এই আশায় যে এর ফলে হয়তো বা আমি ব্রিটিশ প্রজারূপে পরিগণিত হবো। আমি ভুল করেছি এখন বুঝতে পারছি।

কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে থাকি, ব্রিটিশদের বিজ্ঞপ্তি দেখে আমি খুব ভীত হয়ে পড়ি। আমার মনে হয়েছিল আমার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নেওয়া হবে। তাই প্যারী চলে এসে গা ঢাকা দিই। সেখানে মদের আড্ডায় একজন লোক আমাকে বাহিনী-ত্যাগী ভেবে আমার জন্য পাশপোর্ট জোগাড় করে দেবে বলে। আমি রাজী হয়ে যাই। সে আমাকে অর্থের বিনিময়ে একটা পাশপোর্ট এনে দেয়, তাই নিয়ে আমি সুইজারল্যাণ্ডে যাত্রা করি। পরের ঘটনা আপনারা জানেন। আমি ভুল করে অন্যায় করেছি, কিন্তু তা হলেও প্রমাণ হয় না জার্মানীর পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করেছি।

এরপর একজন ইংরেজ সাক্ষীকে আনা হলো। লোকটা প্রথমে ফোর্থ আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের পোষ্ট-অফিসের কর্পোরাল ছিল, পরে তাকে ফিফ্‌থ আর্মির সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। ওর ভাই জার্মানীতে বন্দী থাকায় সে আমার জার্মানীস্থিত যুদ্ধবন্দী বন্ধুর চিঠিপত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ

আগ্রহী ছিল। এমন কি তার ঠিকানাটা পর্যন্ত তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সে বল্ল যে তার ভাইয়ের কাছ থেকে সে যেমন ফিল্ড-পোষ্ট কার্ড পেতো, গ্রীনের কাছেও সেই রকম কার্ড আসতো আর্ তাতে সন্দেহ করবার মত কোনো চিহ্ন সে কোনো দিনও দেখেনি।

শেষ চিঠি কবে পেয়েছি—প্রেসিডেণ্ট আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি জানালাম প্রায় একমাস আগে। সঠিক তারিখ জিজ্ঞাসা করাতে আমি বল্লুম, মে'র শেষে কিম্বা জুনের প্রথমে।

শেষ সাক্ষীর বিবৃতিতে জানতে পারলুম ফিগসন অসুস্থ হয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে গেছেন। তাঁর কাছে আমার সম্বন্ধে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। কোর্টে সেটা পড়া হলো। যেমনটি আশা করছিলাম, ফিগসন ঠিক তাই লিখেছেন। তাঁর ধারণা অভিযোগগুলো অসম্ভব। আমি খুব বিশ্বাসী ও কুশলী ছিলাম তাঁর পক্ষে। সাড়ে তিন বছর আমি তাঁর সংগে ছিলুম, এই সময়ের মধ্যে এমন কোনো ঘটনার কথা তিনি জানেন না, যা তাঁর সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। উপরন্তু ফিগসন কোর্টকে অনুরোধ করেছেন যে আমার ওপর তাঁর যে অগাধ বিশ্বাস আছে কোর্ট যেন তা বিশেষ বিবেচনা করে দেখে।

ফিগসনের বিবৃতি যখন পড়া হচ্ছিল, তখন আমি আমার মনোবল ফিরে পাচ্ছিলাম। বিচার-মণ্ডলীর সদস্যরা পরস্পর ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ করছিলেন, স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ফিগসনের বিবৃতি তাঁদের মনে আমার সম্বন্ধে কিছুটা অনুকূল- ধারণার সৃষ্টি করেছে। সর্বশেষ সাক্ষীর সাক্ষ্য-দান তখনো শেষ হয় নি। হঠাৎ আমার ফিরে-আসা আশার ঝলক মিলিয়ে গেল তার একটা কথা শুনে। আমার যুদ্ধ-বন্দী বন্ধুটীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জানতে পারা গেছে লোকটী এই বছরের মার্চ মাসে মারা গেছে!

প্রেসিডেণ্ট আমার দিকে ফিরে বল্লেন, লোকটা মার্চ মাসে মারা গেছে, অথচ তুমি মে'র শেষে কিম্বা জুনের প্রথমে তার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছো !

আমতা আমতা করে জবাব দিলাম, হয়তো আরো আগেই পেয়ে থাকবো, ঠিক স্মরণ করতে পাচ্ছি না।

আমার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সাক্ষী জানালো, আমার অন্তর্ধানের পর সে আমার জিনিষপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল, কিছু সন্দেহজনক তথন পাওয়া যায় নি অবশ্য। কিন্তু তার দুদিন পরে সেই যুদ্ধ-বন্দীর কাছ থেকে আরেকটী চিঠি এসে উপস্থিত হয়। চিঠিটী কোর্টে দেখানো হলো।

প্রেসিডেণ্ট মন্তব্য করলেন, তোমার বন্ধুটী মার্চ মাসে মারা যাবার পর জুলাই মাসেও চিঠি পাঠায় ! অদ্ভুত ব্যাপার !

হায় ! আমার মত উল্‌ফ্‌গ্যাং-ও কি জানতো না জার্মানীতে সেই যুদ্ধ-বন্দীটী মারা গেছে ? বোধ হয়, ওকে কেউ বলে নি।

পরপর কতগুলি জেরা থেকে বিবেচনা করে প্রেসিডেণ্ট মন্তব্য করলেন, আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ হলেও চিঠিপত্রগুলো দ্ব্যর্থবোধক।

আবার আমাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

নির্জন সেলের মধ্যে একের পর এক গোয়েন্দা-বিভাগের কর্তারা আমাকে উত্যক্ত করতে লাগলো। অনেক কথা আমার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে, যা আমি কিছুই প্রকাশ করি নি। ফ্রান্সে জার্মানীর গুপ্তচর বিভাগের কার্য-পদ্ধতি জানালে আমার দণ্ড মকুব হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছিল আমাকে।

কেবলি আমাকে শোনানো হচ্ছিল, জার্মানীর পরাজয় আসন্ন। ফশ্‌ আক্রমণ করেছেন, আক্রমণোদ্যোগ ওদের হাতে। প্রতি মাসে

আমেরিকানদের আড়াই লাখ সৈন্য এসে পৌছচ্ছে। প্রায় খতম হয়ে এলো অষ্ট্রিয়া। জার্মানীর পতন অনিবার্য।

ধৈর্য না হারিয়ে আমি বল্লুম, আমার ও আপনাদের দেশের অনন্ত-কালীন সংঘর্ষের এটা মাত্র একটা রাউণ্ড। জার্মানীর পতন অসম্ভব।

তারপর এক সময় আমাকে ত্যাগ করে ওরা চলে গেল। একা কত কথাই ভাবতে লাগলুম। ভীত হয়ে পড়েছি কি? না, কিন্তু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। সেই অজানা দুর্জ্ঞেয় আমাকে নার্ভাস করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল অসহ প্রতীক্ষার চাইতে সেই মুহূর্তটা যেন এখনই আসুক। সেলের অন্ধকার পটভূমিকায় জীবনের ঘটনাগুলি জলছবির মত ভেসে উঠছিল মজ্জমান ব্যক্তির চোখের সামনে যেমন দেখা দেয় অতীতের ঘটনাবলী। তারপর ভোর হলো, সোয়ালোদের কাকলি শোনা গেল। সশস্ত্র সৈনিকরা আমার চতুষ্পার্শ বেষ্টন করে আমাকে নিয়ে যেতে লাগলো বধ্যভূমির দিকে। প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করে পাদ্রী আমার আগে আগে যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় নিয়ে এসে থামিয়ে দেওয়া হলো আমাকে। একটা পোষ্টের ধারে নিয়ে এল আমাকে। আমাব কোটটা খুলে দেওয়া হলো। আটজন সৈনিকের রাইফেলের চমৎকার লক্ষ্য হয়ে উঠবে আমার শাদা শার্ট। আমার হাত দুটো পিছনে বেঁধে দিল, চোখও বাঁধতে যাচ্ছিল, বারণ করলাম।

রাইফেলের আটটি ব্যারেল আমার বুকের দিকে উদ্যত হয়ে রইলো।

অফিসারের হুকুম শুনতে পাবো, তারপরেই আমার বুকটা ভেঙে পড়বে। মনশ্চক্ষে অন্যান্য গুপ্তচরদের অন্তিম দৃশ্য দেখতে পেলাম। সেই পরিচিত দৃশ্যটি আমিও সৃজন করে যাবো। আমি অধীর হয়ে উঠলাম অসহ্য বিলম্বে। ওরা প্রস্তর মূর্তির মত আমার বক্ষ লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে।

কি হলো জানি না।

বধ্যমঞ্চ থেকে আবার আমাকে অক্ষত; অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হলো সেই নির্জন সেলে। আবার শুরু হলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কে বা কারা আমার বার্তাবাহক ছিল? কে আমাকে পাশপোর্ট দিয়েছে? কোথায়? কবে?

সতেরো ঘণ্টা ধরে অবিরত প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে মারা হলো আমাকে। আমি শুধু অভিশাপ দিচ্ছিলাম। অফিসাররা দয়াপরবশ হয়ে আমার দণ্ড স্থগিত করে দিয়েছে, প্রশ্নের উত্তর দিলে সে দণ্ড বাতিল হয়ে যাবে। আমি যেন পাগল হয়ে উঠবো, আমার মন ও স্নায়ুর ওপর অকথ্য একটানা নির্যাতন আর সহ্য করতে পারছিলুম না। অবশেষে ওরাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আর পরের দিন আমাকে বেসামরিক আদালতে স্থানান্তরিত করলো।

ভার্সাই শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জার্মানদের হাতে বন্দী একটী ফরাসী গুপ্তচরের বিনিময়ে আমি মুক্তি পেলাম। ফিরে এলাম আমার স্বদেশভূমিতে। কিন্তু আমার গৌরবের স্বপ্ন স্বদেশকে ফিরে পেলাম না। সম্রাট, সাম্রাজ্য কিছুই নেই। সোস্যালিষ্টরা ক্ষমতার অধিরূঢ়। আমার কষ্টার্জিত আয়রন-ক্রশ আমার কাছে এলো রেজিষ্টার্ড পোষ্টে।

উলফ্‌গ্যাংয়ের সংগে দেখা করলাম। মিলনের আনন্দে পরাজয়ের তিক্ত বেদনা ভুলে গেলাম। জুলার সংগেও দেখা হলো। নূতন পোল গভর্ণমেণ্ট তার বুদ্ধিমত্তা উপলব্ধি করে প্রচার দপ্তরে বসিয়েছে ওকে।

হিটলারের অভ্যুদয়ে প্রথমে আশান্বিত হয়েছিলাম। পরে বুঝতে

পারলুম সব মিথ্যা। জার্মানী এখন উন্মত্ত-মস্তিষ্কের কবলিত। ইহুদী আর মাতৃভূমির স্নেহ ফিরে পাবে না জার্মানীতে।

দুটো সশস্ত্র লোক আমার ফ্ল্যাটে এসে পরোয়ানা জারী করলো: আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জার্মানী ছেড়ে চলে যেতে আমাকে। আবার সেই আটচল্লিশ ঘণ্টা !!

উলফ্‌গ্যাংকে এর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। নাৎসীরা শেষ করে দিয়েছে তাকে। আমাকে এখন আমার ঠাকুমা'র অনার্যত্বের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জার্মানী ত্যাগ করে।

শান্তি নেই আমার। আমি জানি না কোথায় যাবো, কি করবো। অষ্ট্রিয়ায় থাকার অনুমতি মাত্র দুমাসের জন্য। কোনো বন্ধু নেই আমার। ইংল্যাণ্ডের বন্ধুদের প্রতারিত করেছি, সেখানে আমার পথ রুদ্ধ। কোথায় যাবো ? ওয়ারশ ? জুলা সেখানে রয়েছে।

•নার্স এডিথ ক্যাভেল

নার্স এডিথ ক্যাভেল

সেন্ট মার্টিন প্লেসে এডিথ ক্যাভেলেব মর্মরমূর্তির নীচে ক্ষোদিত আছে কথাকটী : Patriotism is not enough. মূর্তিটীকে দেখলেই মনে হবে ইনি এমন একজন, যাঁর জীবন কঠোর নিয়মানুবর্তীতাব মধ্যে অতি-বাহিত হয়েছে। ক্যাভেলের মত শান্ত অথচ দৃঢ়মনা চরিত্র ইংরেজদের মধ্যেও দুর্লভ।

এডিথ জন্মগ্রহণ করে ১৮৬৫ সালে। নবউইচের নিকটবর্তী সোয়ার-ডেনটন নামক ছোট্ট গ্রামে। সেখানকার নিউ রেক্টরীর পাদ্রী ছিলেন ওর বাবা রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক ক্যাভেল। রেভাবেণ্ড ক্যাভেল কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। গ্রামবাসীদের ধর্ম ও শিক্ষা তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ কবতেন। জীবন যাপনেব যে প্রণালী তিনি তাদের নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্র অবহেলা তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলতো। তিনি প্রকাশ্যভাবে দোষীকে শাস্তি দিতেন। তিনি যখন মারা যান, এডিথ ক্যাভেলের তখন খুবই অল্প বয়স। ছোটবেলার কথা এডিথের মনে ছিল : তার মনে পড়তো রেক্টরীর উদ্যানে মালবেরি গাছটার কথা। ওর মা তা থেকে তৈরী করতেন জ্যাম। রবিবারের কথাও এডিথের মনে পড়তো— সেদিন বইপড়া, খেলাধূলো, সূচিকর্ম সব বন্ধ। সেদিন প্রথমে বাইবেল থেকে প্রশ্ন আর উত্তর, তারপর গীর্জায় দুবার উপাসনা আর সন্ধ্যায় উচ্চকণ্ঠে ধর্মসংগীত।

এডিথের বাল্যকাল সম্বন্ধে খুব কম কথাই জানা গেছে এখনো পর্যন্ত। শুধু জানতে পারা গেছে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মত সেও বাল্যকাল থেকে

পীড়িতের সেবাকার্যে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। ন বছর বয়সে একদিন সন্ধ্যায় এই ফুটফুটে ঘনকৃষ্ণকুন্তলী মেয়েটী কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। সেরাত্রে আর সে ফেরেনি। পরে যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল, দেখা গেল মেয়েটী তাদের প্রতিবেশীর বাড়িতে একটি অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা করছে। বাড়ীতে তাকে না দেখে সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে জানা সত্ত্বেও পীড়িত লোকটীকে একা ফেলে সে কিছুতেই বাড়ীতে একটা খবরও দিতে পারে নি।

এডিথের বাবার মৃত্যুর পর ওর মা নরউইচে এসে এডিথকে ব্রুসেল্‌সের এক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠান। ওর স্কুল-জীবন সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত এডিথের জীবনের বিশদ বিবরণ এখনো অজ্ঞাত। শুধু এটুকু বলা যায় ব্রুসেল্‌স্ শহর এডিথের ভালোই লেগেছিল, কারণ পরবর্তীকালে এডিথ সেখানেই তার হাসপাতাল স্থাপন করে সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছিল।

এডিথ এরপর সুইজারল্যাণ্ড ও পরে ব্যাভেরিয়ায় যায়। শেষোক্ত স্থানে ডাঃ উল্‌ফেনবুর্গের পরিচালিত হাসপাতালে সে কাজ নেয়। হাসপাতালে কয়েকটী বিশেষ শ্রেণীর যন্ত্রাদির অভাব দেখে এডিথ তার উপার্জিত অর্থ থেকে সেগুলি ক্রয় করার ব্যবস্থা করেছিল। এতে ডাঃ উল্‌ফেনবুর্গ কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলে ছিলেন, হাসপাতালের সাধারণ চাঁদার তহবিলে দান করলেই যথেষ্ট হবে।

ডাঃ উলফেনবুর্গ প্রসন্ন প্রকৃতির লোক না হলেও এডিথের জার্মানী অবস্থান সুখকর হয়েছিল। জার্মানদের রীতি-পদ্ধতির প্রশংসা করতো এডিথ। ক্রমে জার্মান জনসাধারণের সংগেও সে পরিচিত হয়ে পড়লো।

১৮৯৬ সালে, ২৯ বৎসর বয়সে লণ্ডন হাসপাতালের নার্সরূপে আত্ম-প্রকাশ করে এডিথ। এক বৎসরের মধ্যেই সে ষ্টাফের অন্তর্ভুক্ত হয়ে

পাঁচ বৎসর সেই পদে যোগ্যতার সংগে কাজ করেছিল। কাজে যোগ দেবার দু বছর পরে মেডষ্টোনে টাইফয়েডের প্রকোপ ক্রমশ বেড়ে উঠে মহামারীর সৃষ্টি করে—কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তা দমন করতে পারছিলেন না। তাঁরা সাহায্যের আবেদন করলে লণ্ডন হাসপাতাল এডিথ ক্যাভেলের নেতৃত্বে একদল শুশ্রূষাকারিণী প্রেরণ করেন। ক্যাভেলের স্বাধীনভাবে কাজ করার এইটাই প্রথম সুযোগ। এই কাজে এডিথ সাফল্য লাভ করে লণ্ডন হাসপাতাল থেকে পুরস্কৃত হয়। কয়েক বছর পরে এডিথ শেরডিচ ও হাইগেটে নার্সিংয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করে। এতে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তেই সে সুইজারল্যাণ্ডে ও ইতালিতে এসে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়। ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে ম্যানচেষ্টারের এক নার্সারীতে সাময়িকভাবে যোগদান করে। এই সময় বেলজিয়ামের সামরিক হাসপাতাল সমূহের কর্তা তাকে বেলজিয়ান নার্সদের উন্নততর শিক্ষাদানের ব্যাপারে তার সহায়তা চাইলে ১৯০৬ সালে এডিথ ব্রাসেলস্ যাত্রা করে। এরপর আর কোনোদিন সে মাতৃভূমিতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য আসে নি।

ব্রাসেল্সে এডিথ ক্যাভেলের কার্যাবলী সাফল্য লাভ করেছিল। সামরিক হাসপাতালের কর্তা ডাঃ দিপাজের নিজস্ব বারকেনদাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট নামক ক্লিনিকের প্রথম মেট্রনের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল এডিথের ওপর। এই ক্লিনিকটী পরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধের ঠিক আগে বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নূতন ও বৃহত্তর অট্টালিকায় স্থানান্তরিত করার জন্য রাজকীয় ভাণ্ডার থেকে তহবিল সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সেই সময় এডিথ নিজেও ব্রাসেল্সে সেণ্ট গিল্সের হাসপাতাল ও নার্সদের শিক্ষার জন্য একটী ইস্কুল নিজস্বভাবে সংগঠিত করছিল। এই সময় থেকেই নার্সিং সমস্যার বিষয়ে এডিথ ক্যাভেল একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত হয়ে ওঠে।

লণ্ডনের আন্তর্জাতিক নার্সিং কংগ্রেসে এসে বক্তৃতাও করে যায়। জার্মানরা ১৯১৪ সালে বেলজিয়াম আক্রমণ করলেও এডিথ ক্যাভেলের মহত্ত্বের কথা তারা জানতো বলে বারকেনদাল ইনষ্টিটিউট এডিথের হাতেই রেখে এটীকে সর্বজাতির আহতদের চিকিৎসার্থ একটী রেডক্রশ হাস-পাতালরূপে গড়ে তুলতে অনুরোধ করেছিল।

এডিথ ক্যাভেলের চরম সাফল্য দেখা গিয়েছিল বেলজিয়ান নার্সিং রীতির পরিবর্তনের কাজে। ব্রুসেল্‌সে ওর আসার আগে বেলজিয়মে যারা নার্সের কাজ করতো, তারা সবই প্রায় গীর্জা থেকে আসতো—নার্সদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিল বেলজিয়মের রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের কর্তব্যের প্রেরণা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ না করা গেলেও. এটুকু বলা যায় সেই সব মেয়েদের শিক্ষা ও জ্ঞান এমন ছিল না যাতে স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ (পীড়িত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যেটা অপরিহার্য) তাদের বুঝানো যেত, আর দারিদ্র্যের জন্য তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা হাসপাতালের কাজের উপযোগী ছিল না। এডিথ ক্যাভেল প্রথমেই তাদের পোষাক পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়ে উঠলো। এর আগে পর্যন্ত বেলজিয়মে নার্সিং বৃত্তি ক্যাথলিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রটেষ্ট্যাণ্টদের সেবাবৃত্তি গ্রহণ করার উপায় ছিল না। সেখানে শুধু এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে কেবলমাত্র মঠের সন্ন্যাসী মেয়েরা কিম্বা অতি দরিদ্র রমণীরাই এবৃত্তি গ্রহণের অধিকারী। এডিথ ক্যাভেল জনসাধারণের এই অজ্ঞ মনোভাবও দূর করতে এগিয়ে এল। সে সর্ব সম্প্রদায় ও সর্বজাতির মধ্যে থেকেই মেয়েদের গ্রহণ করে অতি দ্রুত এক নার্সদল তৈরী করে ফেল্ল।

এডিথ ক্যাভেলের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এই পর্যন্ত এসেও কোনো-রূপ আলোকপাত করতে পারা যায় না। কারণ যে জীবন তার নির্বাচিত পথের লক্ষ্য সন্ধানে শান্ত ও অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে অগ্রসর হয়, তারপর

অকস্মাৎ শহিদের মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়, জীবনীকারের পক্ষে সেই জীবনের খুটিনাটি বিবৃত করা সম্ভব হয় না। মৃত্যু যাকে শহিদ করে, তার জীবন সম্বন্ধে বিমুগ্ধ জনসাধারণ শ্রদ্ধায় অনেক কিছু কাল্পনিক ঘটনা ও বর্ণনা তৈরী করে নেয়। এডিথের মৃত্যুর পর তার সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ফরাসীরা তাকে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত স্বর্গের দেবী বলে বর্ণনা করেছে। এডিথ সম্বন্ধে ওর মাতাপিতার নাকি ধারণা ছিল সে স্বর্গের দেবদূতী।

শোরডিচ ও হাইগেটে থাকার সময় এডিথের সংগে মিস ষ্টোন নাম্নী এক মহিলার প্রগাঢ় সম্প্রীতি ঘটে ছিল এডিথ সম্পর্কে তিনিও অতি অল্প কথাই বলতে পেরেছন। এডিথকে তিনি ভালবাসার চাইতে শ্রদ্ধা করতেন বেশী। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর মহীয়সী রমণীদের মধ্যে অন্যতম এডিথ, অসাধারণ সাহসী ও গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁর কথায়, এডিথের স্বাস্থ্য ভাল না হলেও সে যতক্ষণ না একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়তো, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে যেত, অনেক সময় ডাক্তাররা তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে সরিয়ে দিত কাজ থেকে। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা ও কর্তব্যানুরাগ—এডিথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই কাজের সময় সে যেমন গল্প তামাসা পছন্দ করতো না, আর কাউকেও তা করতে দিত না। মিস ষ্টোন বলেছেন, এডিথ ছিল অসাধারণ গম্ভীর প্রকৃতির আর চাপা। তাঁর কাছেও এডিথ কখনো তার অন্তরতম ইচ্ছা বা বাসনার কথা প্রকাশ করে নি। বান্ধবী মিস ষ্টোনের প্রতি অন্তরের প্রীতিটুকুও তার প্রকাশিত হতো কাজের মধ্য দিয়ে, বাক্যে নয়।

ইউরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত আগে এডিথ ক্যাভেল ব্রুসেলসে ইন্সটিটিউটের জার্মান রোগীদের সেবাকার্যে ব্যাপৃত ছিল। ইতিমধ্যে মহাসমর বেধে ওঠে। বেলজিয়ম সীমান্তের লীজ ও নামুর দুর্গে জার্মানদের

অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ায় বেলজিয়ানরা ভেবেছিল ফরাসী বাহিনী ও ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল ইতিমধ্যে ব্রাসেলস্ রক্ষার উদ্দেশ্যে এসে পড়বে। কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ। ২০শে আগষ্ট জার্মানরা মার্চ করে ঢুকলো রাজধানীতে —১৯১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ব্রাসেলস্ হয়ে রইলো জার্মান শহর।

ব্রিটিশ জনসাধারণের মনে জার্মানদের বেলজিয়ম আক্রমণ গভীর বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল। সমর-প্রচার যখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে, সেই সময় জার্মানদের বেলজিয়মে অত্যাচারের নানাবিধ কাল্পনিক কাহিনী মিত্রশক্তির পত্রিকা-গুলিতে প্রকাশিত হচ্ছিল। ব্রাসেল্‌সে প্রবেশের সময় জার্মানরা বিশেষ কোনো বাধা পায় নি বা অত্যাচারও করে নি। মিস ক্যাভেল, জার্মান সৈন্যবাহিনীর বেলজিয়ম অধিকার প্রীতির চক্ষে না দেখলেও গৃহ ও পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন, অবসন্ন, ক্ষুধার্ত জার্মান সৈন্যদের জন্য উদ্বেগ বোধ করেছিল। জার্মান সৈন্যরা বেলজিয়ান শিশুদের চকোলেট উপহার দিত ও ঘোড়ার ওপর বসিয়ে আদর করতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত বিজয়ী ও বিজিতের পারস্পরিক ঘৃণ্য পরিস্থিতি কোনোদিনও সেখানে ছিল না।

শুভেচ্ছার সংগে জার্মানরা মিস ক্যাভেলকে ইনষ্টিটিউটের হাসপাতালটী সর্বজাতির আহতদের চিকিৎসার জন্য রেডক্রশ হাসপাতালে রূপান্তরিত করার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই পরিস্থিতি সুখকর হয়ে দাঁড়ালো না। কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করলেন যে শত্রু অর্থাৎ জার্মানীর শত্রু দেশগুলির আহত বন্দী সৈন্যরা যাতে পলায়ন না করে, সে বিষয়ে হাসপাতালকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এডিথ ক্যাভেল প্রতিবাদ করে বলেছিল, হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে জেলখানার নিয়ম কানুন সহ্য করতে সে রাজী নয়।

১৯১৪ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনাবলী যারা জানেন, তারা বলতে পারবেন জার্মানদের উত্তর বাহু কিরূপ বিস্ময়কর দ্রুততার

সংগে সীমান্তে সামান্য বাধা পাবার পর বেলজিয়ম ও উত্তর ফ্রান্সে মার্চ করে ঢুকছিল। আক্রমণের এই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় বিজয়ী বাহিনীর ব্যূহের পশ্চাতে শত্রু সৈন্যের অবস্থান রয়েছে। কারণ অসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসার ফলে অধিকৃত দেশের পশ্চাৎভাগে অবস্থানকারী শত্রু-বাহিনী প্রায় অক্ষতই থেকে যায়। এই ক্ষেত্রে বহু ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্য (বন্দী নয়, কারণ তারা অধিকৃত হয় নি, শুধু জার্মান অধিকৃত দেশে আশ্রয়প্রার্থী সৈন্য) ব্রুসেলস ও আশেপাশের শহরগুলিতে ঢুকে পড়ে। এদের মধ্যে যারা আহত হয়েছিল, তারা জার্মান সৈন্যদের সংগেই মিস ক্যাভেলের রেডক্রশ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনীত হয়েছিল। মিস ক্যাভেল এই সব সৈন্যদের সম্বন্ধে জানিয়েছিল, যে মিত্রপক্ষের এই সব আহত সৈন্যদের সংগে সে জেলারের মত ব্যবহার করতে পারবে না অর্থাৎ এরা নিরপেক্ষ হল্যাণ্ড দেশে কোনো রকমে পালাবার চেষ্টা করলে সে বাধা দেবে না। কিন্তু আহত সৈন্যরা ছাড়া আরো অনেকে ছিল, যারা আহত হয় নি, তারা স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য উৎসুক, সম্ভবত সুযোগ পেলে তারাই আবার রণক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যদের সম্মুখীন হতে পারবে। যুদ্ধের প্রথম মাসগুলিতে, ঠিক কোন্ সময়টা জানা যায় নি, এই সৈনিকরা এডিথ ক্যাভেলের কাছে এসে সীমান্ত অতিক্রম করার ব্যাপারে সাহায্য চাইতো। এডিথ তাদের সাহায্য করেছিল।

এ প্রসংগে পাঠকদের জানা উচিত মিস ক্যাভেল যে কাজ করেছে তার অর্থ সে জানতোই। হয়ত সে জানতো না যে সে যে ঝুঁকি নিচ্ছে সেটা হচ্ছে মৃত্যুর ঝুঁকি। তবু সে নিজের দায়িত্বেই সব কিছু করতো। ব্রুসেলস্ অধিকারের পর ফন বিসিং যখন সমগ্র বেলজিয়মের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন তিনি ঐ ধরণের সক্ষম শত্রু-সৈন্যদের কিছু সংখ্যক তাদের স্বদেশে চলে যেতে সমর্থ হচ্ছে জানতে পেরে শত্রু সৈন্যদের

পলায়নে সহায়তা করাকে গুরুতর দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। এডিথ ক্যাভেল তবু তার কাজ বন্ধ করে নি, এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে সব সৈন্যদের পলায়নের ব্যাপারে সে সাহায্য করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার রণাংগনে ফিরে এসে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল।

মিস ক্যাভেল ব্রুসেলসে অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সেবা-ব্রতের কাজে স্বদেশবাসী ও জার্মান সৈনিকদেব মধ্যে কোনো বৈষম্যের প্রশ্রয় দেয় নি সে। অনন্য জাতি নিরপেক্ষভাবে আহত সৈনিকদের সেবায় এডিথ জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল। জার্মান কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করার সিদ্ধান্ত করেছিল। কিন্তু তারা যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো, সেটা নির্মম ও আকস্মিকভাবেই এলো। শোনা যায়, তারা একদল গুপ্তচরকে মিস ক্যাভেলের কাছে পাঠিয়েছিল। মিস ক্যাভেলের সেক্রেটারীর কাছে ওরা পলায়নকারী ইংরেজ সৈনিক বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে মিস ক্যাভেল কিভাবে ইংরেজ ও ফরাসী সৈনিকদের পলায়নে সাহায্য করেন তার বিশদ বিবরণ জেনে নিয়েছিল। গল্পটা বিশ্বাস না করলেও বলা যেতে পারে মিস ক্যাভেল বেলজিয়মের জার্মান কর্তৃপক্ষেব আদেশ জেনেশুনেই অমান্য করছিল। তাই কখন ও কি উপায়ে তাব কর্মকলাপ বন্ধ করা যায় সেটা সমস্যা হয়ে উঠেছিল। ১৯১৫ সালের ৫ই আগষ্টের প্রভাতে একটী কর্পোর‍্যাল পাঁচজন সৈনিক সহ এসে তাকে গ্রেপ্তাব করে সেণ্টগিলসের কারাগারে বন্দী করে। মিস্ ক্যাভেল সেখান থেকে ইহজীবনের জন্য আর মুক্তি পায় নি।

ইংল্যাণ্ডে ওব গ্রেপ্তারের খবর যখন এলো, তখন কিছুকাল অতিবাহিত হয়েছে। তখন কার্যত করণীয় ছিলও না কিছু। সমগ্র বেলজিয়ম ইতিমধ্যে

জার্মান কবলিত হয়েছে। ব্রিটেনের কোনো কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিলনা সেখানে। ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যর এডওয়ার্ড গ্রে সংবাদটা পাওয়ামাত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ ব্র্যাণ্ড হুইটলকের সংগে যোগসূত্র স্থাপন করে মিস ক্যাভেলের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে সাধ্যমত চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন।

(যুদ্ধ বাধার প্রথম আড়াই বছর পর্যন্ত অর্থাৎ আমেরিকা যুদ্ধে জড়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকার প্রতিনিধিরাই মধ্যস্থতা করতেন।)

মিস ক্যাভেলের গ্রেপ্তারের খবরে মিঃ হুইটলক বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি যথাসাধ্য করতে উদ্যোগী হলেন। জার্মান গভর্ণমেণ্টকে যে চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন, তারা সেগুলির কোনো জবাব দেয় নি প্রথমে। পরে তাকে জানানো হয়েছিলো যে বন্দী তার অপরাধ স্বীকার করেছে ও কোর্ট-মার্শালের সময় তাকে ব্যবহারাজীবীব সাহায্য নিতে দেওয়া হবে। জার্মান কর্তৃপক্ষ অনেক বিবেচনা ও পরিবর্তনেব পর ব্রাসেল্‌সের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীবী এম সাদি কার্চনারকে মিস ক্যাভেলের পক্ষে উপস্থিত থাকতে দেয়। বেলজিয়ান হিসাবে তিনি তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন বলা যেতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্রোত তাঁর পক্ষে অনুকূল ছিল না। অবশ্য মিস ক্যাভেলের বেলায় কোনো বিশেষ কার্যক্রম অবলম্বিত হয় নি। জার্মান সামরিক আইন অনুসারে এডিথ ক্যাভেলকে গুপ্তচর হিসাবে বিচার করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ আইনের বলে ক্যাভেলের ব্যবহারাজীবী কোর্ট মার্শালের আগে তার সংগে সাক্ষাৎ বা কথা বলার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ছিলেন। এমন কি সাক্ষ্য প্রমাণাদি অর্থাৎ দলিলপত্র, অপরাধী গুপ্তচর সংক্রান্ত তথ্যাদি, তার বিবৃতি ইত্যাদি, যেগুলির ওপর ভিত্তি করে অপরাধীকে অভিযুক্ত

করা হয়েছে, কোনো কিছু একবার দেখে পড়ে নেবারও সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয় নি। তাই ৭ই অক্টোবর ১৯১৫ তারিখে যখন তিনি কোর্ট-মার্শালের সমক্ষে উপস্থিত হলেন, তখন মিস ক্যাভেলের বিরুদ্ধে জার্মান অধিকর্তাদের কি কি অভিযোগ ছিল বা মিস ক্যাভেল তাদের কাছে ব্যবহারাজীবীর পরামর্শ ব্যতিরেকেই কি বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল সেসম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধকারেই ছিলেন।

কোর্ট-মার্শালে উপস্থিত হবার পর কার্চনার কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না। আরো পঁয়ত্রিশজন ব্যক্তির সংগে এডিথ ক্যাভেলকে শত্রু সৈন্যদের বেলজিয়ম থেকে নিরপেক্ষ দেশে পলায়নে সাহায্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সাধারণত জার্মান সামরিক আইনের চোখে এটা অপরাধ হলেও চরম অপরাধ ছিল না। মিস্ ক্যাভেলের বিবৃতি উধৃত করেই প্রসিকিউটর কোর্টকে জানালেন যে সামরিক বয়ঃপ্রাপ্ত বেলজিয়ান যুবকদের রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে মিস্ ক্যাভেল সাহায্য করেছে এবং ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যদের সম্ভবত আরেকবার জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে স্বদেশে ফিরে যেতে অর্থ ও পথপ্রদর্শক দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। তিনি আরো বল্লেন যে পলায়িত সৈন্যরা "আরেকটা দিন যুদ্ধ করতে" সক্ষম হওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে মিস্ ক্যাভেলকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিল, মিস্ ক্যাভেল তা স্বীকার করেছেন। তাই যদি হয়, জার্মান প্রসিকিউটর জোর দিয়ে বল্লেন, এডিথ ক্যাভেল সৈন্যদের শত্রুর রণাংগণে পুনঃচালিত করার চেষ্টার অপরাধে অপরাধী এবং জার্মান সামরিক দণ্ডবিধির মতে তার শাস্তি মৃত্যু।

এডিথ ক্যাভেল উপরোক্ত বিবৃতিদান করেছিল কিনা তা এখনো জানা যায় নি। তবে ফরাসী, ইংরেজ ও বেলজিয়ান সৈনিকদের পলায়নে সহায়তা করেছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। যারা আহত হয়ে যুদ্ধকাজের

অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিল, শুধু যে তাদের মধ্যেই তার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল, একথা কখনোই বলা যায় না। এডিথ নিজেই জানিয়েছিল তার হাসপাতাল জেলখানা নয়। শান্তির সময়কার আইনবিধি অনুযায়ী, বন্দী অবস্থায় বিচারের পূর্বে মিস ক্যাভেল তার ব্যবহারাজীবীর সংগে পরামর্শ করতে পারলে হয়ত স্বীকারোক্তি নাও করতে পারতো। কিন্তু মিস্ এডিথ ক্যাভেলের চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেছে, তাতে তার পক্ষে সত্য গোপন করা অসম্ভব ছিল—তার মধ্যে ছিল সরল সততা, যা পরিণতির বিবেচনা না করেই মানুষকে কেবল কর্তব্য সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

কার্চনার যখন সাহায্য করতে এলেন, তখন তার অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। ৮ই অক্টোবর বিচার কার্য শেষ হয়। এডিথ ক্যাভেলকে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে দোষী সিদ্ধান্ত করা হলেও তাকে আদৌ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কিনা এ বিষয়ে হুইটলকেরও সন্দেহ ছিল। তাই ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যায় মিস্ ক্যাভেলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলে আর পরদিন প্রভাতেই দণ্ড কার্যকরী করার কথা ঘোষিত হলে হুইটলক্ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে যান। শেষ মুহূর্তে মিস্ ক্যাভেলের মৃত্যু-দণ্ড মকুব করার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু সবই বৃথা হয়; ফায়ারিং পার্টি ১২ই অক্টোবর সকালে তাকে গুলি করে হত্যা করে।

হুইটলক এক বিষয়ে সফলকাম হয়েছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ব্রাসেল্‌সে অবস্থিত ক্রাইষ্ট চার্চের ইংরেজ চ্যাপলেন মিস্ ক্যাভেলের সংগে মৃত্যুর পূর্বে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে মিস্ ক্যাভেল তাঁর কাছে বলে: আমি বিন্দুমাত্র ভীত বা আশংকিত নই। মৃত্যু আমি এত অধিক দেখেছি যে তা আমার কাছে অজ্ঞাত বা ভয়ংকর মনে হয় না। আমার জীবনাবসানের পূর্বে এই যে দশ সপ্তাহের বিশ্রাম পেলাম তার জন্য ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ জানাই। আমার

জীবনের পথ সর্বদাই ছিল কণ্টকিত ও সমস্যাসংকুল। অবকাশের এই ক্ষণটীকে আমি অভ্যর্থনা করে নিয়েছি আনন্দে। আমার প্রতি সকলের ব্যবহারই ছিল সুন্দর। বিধাতা ও অনন্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন আমি উপলব্ধি করি স্বদেশপ্রেমিকতাই যথেষ্ট নয়। কারুর প্রতিই আমি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করি না।

এডিথ ক্যাভেলের মৃত্যুর সংবাদ মিত্র দেশগুলিতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য একথা ঠিকই যে এ ব্যাপারে মিত্র সংবাদপত্রগুলির পক্ষে জার্মান-বিরোধী প্রচারকার্যের নতুন করে সুবিধা হয়। জনসাধারণ এডিথ ক্যাভেলের মৃত্যুতে গভীর শোকাভিভূত হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য। তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে সেণ্ট পলের গীর্জায় উপাসনা হয়েছিল। তার মৃত্যুর খবর যথেষ্ট প্রচারিত হবার পর লণ্ডনের রিক্রুটিং অফিসগুলি দিনের পর দিন ধরে জনাকীর্ণ হয়ে উঠে। এডিথ ক্যাভেলেব মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্রিটিশ জনসাধারণ দলে দলে সৈন্যদলে যোগদান করবার জন্য এগিয়ে আসে। সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এই দিকটা বিচার করলে মনে হয় এডিথ ক্যাভেলের হত্যা বিধান জার্মান কর্তৃপক্ষের পক্ষে ভুল হয়েছিল।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এডিথ ক্যাভেলের মৃত্যুদণ্ড হলেও জার্মান গভর্ণমেণ্ট শুধুমাত্র মিত্রপক্ষের সৈন্যদের পলায়নে সহায়তা করা ছাড়া এডিথ ক্যাভেলের বিরুদ্ধে অন্য কোনো কার্যকলাপের অভিযোগ করেনি। এডিথ ক্যাভেল সামরিক গোপন্ তথ্যাদি লুণ্ঠন করে মিত্রপক্ষকে জানাবার কোনো চেষ্টা করে নি। ক্যাভেল সত্যিই এমন কিছু করে নি যা সাধারণ মানুষের পক্ষে লজ্জাকর। শান্তির সময়ে বা সামরিক কালে তার দ্বারা যেটুকু সম্ভব হয়েছিল তা মানবিক দিক থেকে মহত্তর। এডিথ ক্যাভেল কার্যত সৈনিকের মৃত্যুবরণ করেছে।

● ব্রিটেনে জার্মান গুপ্তচর

কার্ল হান্‌স লোদি

এণ্টন কুপফার্ল

পিটার হান্ এবং মুলের

কনরাড লেএটার

ব্যারন অটো ফন গুম্পেনবার্গ

জ্যানসেন এবং উইলিয়ম জোহানেস রুস

জর্জ টি. ব্রিকাউ এবং লিজি হ্বারথেম্

ফার্নাণ্ডো বুসম্যান

ব্রিটেনে জার্মান গুপ্তচর

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনে যে কজন জার্মান গুপ্তচর ধৃত হয়েছিল, কার্ল হানস্ লোদির নাম তাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য। স্বদেশ সেবার প্রেরণায় গুপ্তচরের বিপজ্জনক জীবন বৃত্তি গ্রহণ করেছিল সে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অনেকদিন থাকার ফলে ইংরেজী ভাষাজ্ঞান ও আমেরিকান ঢংয়ে উচ্চারণটা তার বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জার্মান নৌবাহিনীতে তার কমিশন থাকা ছাড়াও লোদি রিজার্ভ বাহিনীরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণের পূর্বে লোদি হামবুর্গ-আমেরিকা ষ্টিমশিপ লাইনে পর্যটকদের গাইড হিসাবে চাকরী করতো। টমাস কুক এণ্ড সনের অফিসেও একটা চাকরীর চেষ্টা করেছিল একসময়। চাকরীর কাজে লোদিব পক্ষে সাবা ইংলণ্ডে ঘুরে বেড়ানার সুযোগ হয়েছিল। যুদ্ধ বাধার চারদিন আগে লোদি নরওয়ে থেকে আসে বার্লিনে। এখানে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের সংগে তার সংযোগ ঘটে। বার্লিনে সেই সময় চার্লস এ ইংলিশ নামে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ইউরোপ-পর্যটনের মানসে জার্মানীস্থিত আমেরিকার দূতাবাসে তাঁর পাশপোর্টের 'ভিসা'র জন্য আবেদন করেছিলেন। আমেরিকান দূতাবাস ঐ উদ্দেশ্যে পাশপোর্টটী পাঠিয়ে দেয় জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে। সিক্রেট সার্ভিসের ষড়যন্ত্রে ইংলিশের পাশপোর্টটী লোদির হস্তগত হয়েছিল। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে আমেরিকান ভদ্রলোকটীর পাশপোর্ট এইভাবে হারিয়ে যাওয়ায় তাঁকে নূতন একখানা ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া পররাষ্ট্র দপ্তর এবিষয়ে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ইংলিশের প্রথম পাশপোর্টটী থেকে ভদ্রলোকের ফটোটি তুলে ফেলে

লোদি সে জায়গায় নিজের একটি ফটোগ্রাফ এঁটে দিয়েছিল। ইংলিশ বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে লোদি এডিনবরার নর্থ ব্রিটিশ ষ্টেশন হোটেলে এসে উপস্থিত হয়, সেখান থেকে ষ্টকহোমের এ্যাডল্‌ফ বুরচার্ডের নামে এক টেলিগ্রাম পাঠায়। সেন্সর কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামটি সন্দেহজনক মনে করে গোপনে লোদির ওপর নজর রাখতে শুরু করেন। লোদি হোটেলে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে একটা বাড়ী ভাড়া নেয়। তারপর এডিনবরা থেকে চলে আসে লণ্ডনে। বিমানাক্রমণ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সে খুব আগ্রহ দেখায়। দুদিন পরে আবার যায় এডিনবরায়। সেখান থেকে লিভারপুলে। সেখানে জাহাজগুলোকে ক্রুজারে রূপান্তরিত করা হচ্ছিল। আরো কিছুদিন ইতস্তত ঘোরাঘুরির পর লোদি যায় আয়র্লণ্ডে। এখানে তাকে পুলিশ সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করে—লোদি এতে ঘাবড়ে যায়। ডাবলিনের গ্রেসাম হোটেল থেকে সে তার এক সুইডিশ বন্ধুকে চিঠি লিখে জানালো সে নার্ভাস বোধ করছে। লোদির লেখা চিঠিপত্রে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—সাধারণ কালিতে ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় বিশেষ কোনোরূপ লুকোচুরির আশ্রয় না নিয়ে বরাবর চিঠি লিখতো সে। অবশ্য যেসব সংবাদ সে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল, সেগুলি বিশেষ মূল্যবান ছিল না। তার কোনো চিঠিই জার্মানীতে পৌছাতে দেওয়া হয় নি, শুধু ইংল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে রুশ সৈন্যদের চলাচলের খবরটুকু ছাড়া।

ডাবলিন থেকে লোদি কুইন্সটাউন যাবার পথে কিলারনিতে এসে পৌছলে ২রা অক্টোবর রয়াল আইরিশ কনষ্টেবুলারী তাকে আটক করে রাখে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে গোয়েন্দাদের না আসা অবধি। ওর জিনিষ পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় চুরি করা পাশপোর্টটা, কিছু সোনা আর বিলিতি নোটে মিলিয়ে প্রায় পৌনে দুশ পাউণ্ডের মত, কয়েক সপ্তাহ আগেকার উত্তর সমুদ্রের নৌযুদ্ধের বিবরণ, বার্লিন, ষ্টকহোম, বার্জেন ও হামবুর্গের

কয়েকটা ঠিকানা লেখা নোটবই আর ইকহোমে লেখা ওর চারটে চিঠির নকল। কোর্ট মার্শালের রায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে লিখে গিয়েছিল :

'আমার প্রিয়জনেরা,—ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার অটুট আছে, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমার সময় আসন্ন। জাতির বিরুদ্ধে জাতির এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ কমরেডদের মত আমারও এবার যাত্রা শুরু হলো তমোগহন উপত্যকা দিয়ে। পিতৃভূমির বেদিমূলে আমার জীবন সামান্যতম অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গীত হোক।

রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু নিঃসন্দেহে মহত্তর। আমার ভাগ্য অন্যরূপ। আমাকে শত্রুর দেশে নিঃশব্দে ও সকলের অগোচরে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে, তবু স্বদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার চেতনা আমার মৃত্যুকে সহজ করে দিয়েছে।......

জার্মান গভর্ণমেণ্ট লোদির স্বজনবর্গকে পুরস্কার স্বরূপ তিনহাজার পাউণ্ড দান করেছিল। মৃত্যুর কয়েকমাস পরে খবরটা জার্মানীতে পৌছলে গ্রামবাসীদের কাছে লোদি হয়ে উঠে শহিদ। ওর নামে তারা একটি ওক গাছের চারা রোপন করে লোদির স্মৃতি চিরজাগরুক রাখার প্রয়াস পেয়েছিল।

১৯১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর লিভারপুলে আরেকজন জার্মান গুপ্তচর এসে হাজির হয়েছিল। স্বদেশপ্রীতি বা সাহসিকতায় লোদির সমকক্ষ না হলেও কূটবুদ্ধিতে সে ছিল তার চাইতেও ওস্তাদ। লোকটীর নাম এণ্টন কুপফার্ল, জার্মান সেনাবাহিনীর নন-কমিশণ্ড অফিসার বলে অনুমিত। ফন প্যাপেন একে টাকা জোগাত। ইংরেজী উচ্চারণ ও ভাষাজ্ঞানের অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ফন প্যাপেন কি করে একে ইংলণ্ডে গুপ্তচররূপে প্রেরণ করেছিল বোঝা দুষ্কর। ব্রুকলিনে একসময় কুপফার্ল

এণ্ড কোং নাম দিয়ে লোকটী পশমের ব্যবসা করেছিল, ইংল্যাণ্ডে সে তাই নিজেকে উলের দ্রব্য-ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়েছিল। জাহাজে আসার সময় যাত্রীদের সংগে আলাপ হলে বলতো, সে আমেরিকার নাগরিক, ইংল্যাণ্ডে তার কাজ-কারবার আছে। লিভারপুল থেকে হল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে অদৃশ্য কালিতে লেখা তার চিঠিটাই সম্ভবত ইংল্যাণ্ডে ধৃত গুপ্তচরদের প্রথম অদৃশ্য কালির লিপি। চিঠিটাতে আটলান্টিক অতিক্রম করার সময় সে যে ৫টী যুদ্ধজাহাজ দেখেছিল, তার খবর ছিল। লিভারপুল থেকে সে যায় ডাবলিনে, ডাবলিন থেকে লণ্ডন, সেখানে মালপত্র শুদ্ধ তাকে আটক করে নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। অদৃশ্য কালির সরঞ্জাম ও উল্লিখিত অদৃশ্যকালিতে লেখা চিঠির অনুরূপ কাগজের প্যাড তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল।

নিজের সম্বন্ধে কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে নি কুপফার্ল। তাই বিচারের প্রথম দিনেই তার ফলাফল সম্বন্ধে কারুর মনেই কোনো সন্দেহ ছিল না। বিচারও একদিনের বেশী চলে নি। প্রথম দিনেই গলায় রেশমী টাইয়ের ফাঁস লাগিয়ে কুপফার্ল সেলের ভেন্টিলেটর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেলের মধ্যে একটা শ্লেটের গায়ে সে লিখে গিয়েছিল :

‘আমার নাম কুপফার্ল। জন্ম সলিঞ্জেন, রাসটাট (ব্যাডেন)। আমি একজন সৈনিক, অবশ্য আমার পদমর্যাদা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি না। যুক্তরাজ্যে আমার বিচার ন্যায়সংগতভাবে হলেও আমি আর মানসিক চাপ সহ্য করতে পারছি না, তাই বিচারের ভার নিজের হাতেই তুলে নিলাম। অনেক যুদ্ধ আমি করেছি, এখন মৃত্যু আমার একমাত্র ত্রাণকর্তা।...আশা করি এই বিশ্বের সর্বশক্তিমান স্থপতি আমাকে চালিত করবেন অজানা প্রাচীভূমির উদ্দেশ্যে। আমি গুপ্তচরের মৃত্যু বরণ করছি

না, আমি গ্রহণ করলাম সৈনিকের মৃত্যু। ...সলিঞ্জেন, রাসটাটে আমার খুড়ো এমব্রোস ব্রোলকে অনুগ্রহ করে সংবাদ দেবেন। আমার সমস্ত সম্পত্তি উনিই পাবেন।

যা করেছি সবই স্বদেশভূমির জন্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। আপনাদের এ্ন্টন কুপফাল´...'

শ্লেটের উল্টো পিঠে লেখা ছিল :

আমার বয়স ৩১, জন্ম ১১ই জুন, ১৮৮৩।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরের গোড়া থেকেই জার্মানরা শত্রুর দেশগুলিতে দলে দলে গুপ্তচর পাঠাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল; এই বিষয়ে হল্যাণ্ড হয়ে উঠেছিল তাদেব মস্ত বড় ঘাঁটি। গুপ্তচর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হল্যাণ্ডে জার্মানরা অসংখ্য অফিস স্থাপন করেছিল। সাধারণের চোখে ধূলো দেবার জন্য অফিসগুলোকে সাজানো হতো ঠিক সওদাগরী অফিসের মত। অফিসে ঢুকতে প্রথমে চোখে পড়তো শো-কেসে সাজানো সস্তাদরের চুরুট ও অন্যান্য দ্রব্যের কিছু কিছু নমুনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যিকার কয়েকটা ব্যবসায়ী কোম্পানী (যাদের অস্তিত্ব কোনোক্রমে টিকে থাকার মতো ছিল) জেনেশুনেই আর্থিক লাভের আশায় তাদের অফিস ভাড়া দিয়েছিল। হল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় জার্মান গোয়েন্দাদের এই রকমের অনেক অফিস ইতস্তত গজিয়ে উঠেছিল।

ইংল্যাণ্ড থেকে বহু চিঠিপত্র হল্যাণ্ডের ঐসব ঠিকানার উদ্দেশ্যে ছাড়া হতো। সেন্সর কর্তৃপক্ষ কিছুদিন যাবৎ এইসব চিঠি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। অনেক চিঠি আবার অদৃশ্য কালিতেও লেখা থাকতো। প্রথমটা অসুবিধা হয়েছিল প্রেরকের ঠিকানা নির্ণয় করা, কারণ চিঠিগুলিতে কোনো ঠিকানা থাকতো না, উপরন্তু চিঠিগুলি লণ্ডনের বিভিন্ন ডাকঘর

মারফৎ ছাড়া হতো। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ঐটুকু বুঝেছিলেন পত্র-প্রেরক বিদেশী। লোকটা প্রত্যেক চিঠিতে ক্রমাগত টাকার জন্য তাগিদ দিত। তাই আশা করা গিয়েছিল, হল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত অর্থের ওপর নজর রাখা হলে লোকটার ঠিকানা নিশ্চয়ই নির্ণীত হতে পারে। হঠাৎ এই সময় অদৃশ্য কালিতে লেখা একটা চিঠি পড়ে জানা যায় যে 'সি' নিউক্যাসলে গেছে, তাই এই চিঠিটা '২০১' থেকে লেখা হচ্ছে। চিঠির খামে ডেপ্টফোর্ড ডাকঘরের ছাপ ছিল। অবিলম্বে ওখানকার পুলিশ-ষ্টেশনে ফোন করে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জেনে নিলেন যে ওখানে ২০১ নম্বর বাড়ী একমাত্র ডেপ্টফোর্ড হাই ষ্ট্রীটেই আছে, সে বাড়ীতে পিটার হান্ বলে জার্মান নামের একজন পাঁউরুটী ওয়ালা থাকে।

পিটার হান ওখানকার পুরোনো বাসিন্দা। ওকে গ্রেপ্তার করে বাড়ীতে তল্লাশী করে পুলিশ পিছনদিককার ঘরে একটা কাবার্ডের মধ্যে অদৃশ্য কালির সরঞ্জাম আবিষ্কার করেছিল।

হান কোনো স্বীকারোক্তি করেনি। গোয়েন্দারা প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন ঢ্যাঙা চেহারার এক কৃশ ভদ্রলোক হানের সংগে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ করে, নাম ম্যুলের, থাকে ব্লুমস্‌বারীতে। পুলিশ সেখানকার ভাড়াটেদের নামের রেজিষ্ট্রার ঘেঁটে তার ঠিকানা আবিষ্কার করলো। ম্যুলেরকে সেখানে পাওয়া গেল না। তার বাড়ীওলিকে জিজ্ঞাসা করতে সে বল্লে, লোকটা নিউ ক্যাসেলে বন্ধুদের সংগে দেখা করতে গেছে। ম্যুলেরকে সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করে লণ্ডনে নিয়ে আসা হলো। জেরার সময় লোকটা হানের সংগে তার ঘনিষ্ঠতা বেমালুম চেপে গেল। হান্‌কে সে নাকি চেনেই না। জার্মানীতে যায় নি কখনো, জার্মান ভাষাও জানে না সে। পুলিশও নাছোড়বান্দা হয়ে তার অতীত জীবন সম্বন্ধে তদন্ত করতে লাগলো। ম্যুলেরের পরিচয়

পাওয়া গেল অবশেষে। লোকটা জার্মান, স্থায়ী কাজকর্ম না থাকার ফলে ভবঘুরের মত ইতঃস্তত ভ্রমণ করে কোথাও হোটেল চালিয়েছে, কোথাও বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির কাজ করেছে। লিবাউতে জন্মগ্রহণ করার জন্য লোকটা রুশ নাগরিক বলেও দাবী করতে পারে। রুশ ছাড়া সে বলতে পারতো ফ্লেমিশ, ডাচ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইংরেজী। হান্ তো তার হাতের পুতুল। সে জন্মেছে ব্যাটার্সিতে, সেই দিক থেকে তাকে ব্রিটিশ নাগরিক বলা যেতে পারা যায়। হান্ অর্থাভাবের ফলে তার ফাঁদে পা বাড়িয়েছিল। ১৯১৩ সালে সে আর্থিক সর্বস্বান্ত হয়। তখন তার সম্বল ছিল মাত্র তিন পাউণ্ড, অথচ দেনা ছিল ১৮০০ পাউণ্ডের। ১৯১৫ সালের মে মাসে ওল্ড বেইলী কোর্টে দুজনকে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যুলেরের হয় প্রাণদণ্ড, হানের হয় সাত বছর সশ্রম কারাবাস।

ঐ বছরের মধ্যভাগে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়েছিল রটারডাম থেকে ব্যুয়েনোস এয়ারিশগামী ষ্টিমারে কনরাড লেএটার নামক আর্জেণ্টিনার এক ভদ্রলোক বার্লিনের কোনো গোপন দলিল মাদ্রিদের জার্মান দূতাবাসে পৌছে দেবার জন্যে যাচ্ছে। খবরটা পাওয়া মাত্র লেএটারকে ষ্টিমার থেকে নামিয়ে লণ্ডনে নিয়ে আসা হলো। লেএটার নিজেকে জাহাজের কর্মচারী বলে পরিচয় দিয়ে বল্লে, ছুটিতে ইউরোপ ভ্রমণে এসেছিল, এখন ফিরছে ব্যুয়েনোস এয়ারিশে। আসল কথাটি চেপে চেপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে জার্মানী ও হল্যাণ্ডে ছুটি উপভোগের রোমাঞ্চকর কত গল্পই সে বকে গেল! গোয়েন্দা পুলিশ যখন তার স্পেনে যাবার উদ্দেশ্য জানতে চাইলো, তখনো সে ফের বাজে গল্পের অবতারণা করলে। পুলিশ তার গল্পে কান না দিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, স্পেনে কিজন্যে যাচ্ছিলেন? লেএটারের সঠিক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত

ধৈর্যের সংগে ঐ একই প্রশ্ন ক্রমাগত করা হচ্ছিল। অবশেষে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সত্য গোপন করে রাখার সামর্থ্য হারিয়ে ফেল্ল। চীৎকার করে বল্লে, স্পেনে কিজন্যে যাচ্ছি জানতে চান? মাদ্রিদের জার্মান রাষ্ট্রদূত প্রিন্স র‍্যাটিবুরের হাতে একটি গোপন দলিল পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধন্যবাদ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুলিশ পুনরায় প্রশ্ন করলো, দলিলটা কোথায়?

আমার কেবিনের লাইফবেল্টের ভেতর সেলাই করে দেওয়া আছে।

এইরকমে বহু গুপ্তচর যথাস্থানে পৌঁছবার পূর্বে জাহাজ থেকে ধৃত হয়েছিল। এক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ গোয়েন্দা-পুলিশ সফল হয়েছিল। ১৯১৫ সালের অক্টোবরে ভূমধ্যসাগরের এক জাহাজে যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় বোর্ডিং অফিসার জাল ছাড়পত্রসহ এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। ইজিপ্টে তাকে আটক করে তদন্ত চালানো হয়েছিল। জাল ছাড়পত্র ছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না। লোকটার দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একদিন এক ব্রিটিশ অফিসার সেখানে অন্য কাজে উপস্থিত হয়েছিলেন, লোকটাকে দেখে তার পিঠ চাপড়ে তিনি বলে উঠেন, হ্যাল্লো, গুম্পেনবার্গ। লোকটা তার পরিচিত ব্যক্তির সামনে একেবারে নার্ভাস হয়ে যায়। একে একে সব কথাই প্রকাশ হয়ে যায় তার মুখ থেকে।

লোকটা জার্মানীর ডেথস্ হেড হুসার বাহিনীর একজন স্কোয়াড্রন অফিসার, নাম ব্যারন অটো ফন গুম্পেনবার্গ। ইতিপূর্বে কোন এক কেলেংকারিতে জড়িত থাকার ফলে তাকে সাত বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। মুক্তির পর নানাস্থানে চাকরীর জন্য ঘুরে বেড়িয়েছিল। কনষ্ট্যান্টিনোপলে এনভার পাশার এডিকংরূপে কিছুদিন কাজ করেছিল।

প্রিন্স উইল্‌হেম অব হ্বাইড যখন এলবানিয়ার শাসনাধিকার হস্তগত করবার ব্যর্থ চেষ্টায় রত ছিলেন, গুস্পেনবার্গ তখন তাঁর সংগে যোগ দিয়েছিল। লড়াই শুরু হলে সে ফিরে যায় জার্মানীতে। রুশ রণাংগণে অসীম বীরত্ব দেখিয়ে আহতাবস্থায় ফিরে এলে পর গুস্পেনবার্গকে তার পূর্বেকার সামরিক পদ প্রত্যর্পণ করা হয়। এই সময় উত্তর আফ্রিকার নেটিভদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধাবার পরিকল্পনা হলে সেনুসিদের ব্যাপারে কি করা যায় দেখবার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেনুসিরা কিছু সংখ্যক ইতালীয় বন্দী ধৃত করেছিল। গুস্পেনবার্গ তাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ করতে সেখানে যাবার চেষ্টা করছিল। সেই সময় জাহাজে সে ধৃত হয়েছে। শেষের কথাটি তার মিথ্যা বলে অনুমান করা গিয়েছিল। গুস্পেনবার্গের আসল উদ্দেশ্য ছিল সেনুসি ও অন্যান্য উপজাতীয়দের মধ্যে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি দেওয়া।

আগেই বলা হয়েছে জার্মান গুপ্তচররা যুদ্ধের গোড়ার দিকে ভূয়া ব্যবসার অন্তরালে কাজ করবার জন্য বেশ তৎপর হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের সেন্সর কর্তৃপক্ষও এই সময় ইংল্যাণ্ড থেকে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদল কর্তৃক হল্যাণ্ডে উপর্যুপরি বিপুল পরিমাণ সিগারের অর্ডার প্রেরণে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে একটি ঘটনার ফলে তাদের সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। জ্যানসেন ও রুস নামক দুজন বিদেশীকে লণ্ডনের দুটী ভিন্ন জায়গায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ জেরা করবার উদ্দেশ্যে তাদের নিয়ে এসেছিল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। জ্যানসেন নিজেকে ডাচ নাবিক বলে পরিচয় দিয়েছিল। সে নাকি কখনো জার্মানিতে যায় নি বা জার্মান ভাষাও জানে না। ডায়ার্কস এণ্ড কোং'র একমাত্র প্রতিনিধি রূপে সিগারের ব্যবসায়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছে। তার মত একজন নাবিককে কেন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করা হয়েছে প্রশ্ন করা

হলে সে তার কোন সদুত্তরই দিতে পারেনি। শুধু সে ইংরেজী বলতে পারতো ও চাকুরীপ্রার্থী ছিল বলেই নাকি। রুসকে সে চেনে না। অথচ রুসও ডায়ার্কস এণ্ড কোং'র প্রতিনিধি বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। জ্যানসেনের সম্মুখে তাকে হাজির করা হলে রুস ওকে চেনে বলে স্বীকার করলো।

এরা যে পদ্ধতিতে সংবাদ প্রেরণ করতো তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। টেলিগ্রামে সিগারের অর্ডার যদি এইভাবে থাকতো : ১০,০০০ ক্যাবানা, ৪,০০০ রথসচাইল্ডস, ৩,০০০ করোনা ইত্যাদি, তাহলে আসল অর্থ করা হতো পোতাশ্রয়ে ১০টী ডেষ্ট্রয়ার, ৪টী ক্রুজার আর আর ৩টী যুদ্ধ-জাহাজ অবস্থান করছে।

বিচারকের রায়ে লণ্ডনের টাওয়ারে এদের গুলি করা হয়। জ্যান-সেনকে প্রথমে যখন গুলি করা হয়, রুস তখন ধূমপান করছিল। ধূমপান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে। কিছুক্ষণ পরে সে সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিস্পৃহভাবে চেয়ারে বসে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। সেই সময় তার মুখে এই ভাবটাই ফুটে উঠেছিল যে সিগারেটটা শেষ হওয়ার সংগে তার ঐহিক সব কিছুই যেন শেষ হয়ে গেছে।

১৯১৫ সালের মে ও জুন মাসে ইংল্যাণ্ডে একপক্ষ কালের মধ্যে সাত জন গুপ্তচর ধৃত হয়েছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল রেজিন্যাল্ড রোল্যান্ড (আসল নাম জর্জ্জ টি, ব্রিকাউ) এবং মিসেস লিজি হ্বারথেম্।

ষ্টেটিনের এক পিয়ানো-নির্মাতার ছেলে ব্রিকাউ ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতো। ভালোরকম ইংরাজীও বলতে পারতো। ইংল্যাণ্ডে নিজেকে ধনী আমেরিকান বলে পরিচয় দিত। স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে

নাকি ইংল্যাণ্ডে এসেছে। আমেরিকানদের ধরণধারণ সে এমন রপ্ত করে নিয়েছিল যে তার সত্যিকার জাতীয়তা ধরা অসম্ভব ছিল। ইংল্যাণ্ডে যাবার আগে তাকে লিজি হ্বারথেমের ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল।

লিজি হ্বারথেম জার্মান মহিলা হলেও জার্মান-জাত ব্রিটিশ নাগরিককে বিবাহ কবার দরুন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দাবী করতো। ইংল্যাণ্ডে কিছুকাল ছিল। স্বামীর সংগে সর্তাধীনে বিচ্ছিন্ন থেকে সে বার্লিন, হেগ ও লণ্ডনে হামেশা ঘুরে বেড়াতো।

ব্রিকাউয়ের সংগে পরিচিত হবার পর থেকে লিজি তার যাবতীয় খরচ ওর পকেট থেকে আদায় করতো। লিজি ছিল ফূর্তিবাজ। ব্রিকাউকে সংগে নিয়ে রোজ সকালে পার্কে গিয়ে অশ্বারোহণ করতো। মধ্যাহ্ন ও রাত্রির ভোজনটা ওরা প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরায় সেরে নিতো। খরচটা সমস্ত ছিল ব্রিকাউয়ের। ব্রিকাউ অবশেষে বিরক্ত হয়ে তার কর্তৃপক্ষের কাছে লিজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিল, এর পর সে কোনো মহিলার সংগে কাজ করবে না।

শেষে দুজনের মধ্যে একটা রফা হয়। লিজি সম্ভাব্য উপায়ে সংবাদ আহরণ করে ব্রিকাউকে দেবে, ব্রিকাউ সেগুলি লণ্ডনে বসে লিপিবদ্ধ করে হল্যাণ্ডে পাঠাবে। লিজি এই উদ্দেশ্যে স্কটল্যাণ্ডে চলে যায়। সেখানে একটা মোটর ভাড়া করে ইতস্তত ঘুরে গ্র্যাণ্ড ফ্লিট সম্বন্ধে যেসব গুজব শুনতো টুকে নিত। কিন্তু বুদ্ধি ও পারদর্শিতার অভাব ছিল লিজির। নৌবাহিনীর অফিসারদের সংগে ঘনিষ্ঠতা করে কয়েকটি বিষয়ে সে অস্বাভাবিক কৌতূহল প্রকাশ করেছিল, তার ফলে অফিসার-মহলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। গোয়েন্দারা প্রথমে লিজিকে গ্রেপ্তার করে, তারপর ওর কাছ থেকে ব্রিকাউয়ের ঠিকানা পেয়ে তাকেও গ্রেপ্তার করে। নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ওদের দুজনকে আনা হয়। ব্রিকাউ নার্ভাস হয়ে

পড়ে। পুলিশ তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে দেখে সে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল। ধনী আমেরিকানের ভেক তার এক মুহূর্তেই খসে পড়ে।

লিজি হ্বারথেম কিন্তু মোটেই বিচলিত হয় নি। তার যুক্তি ছিল ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে সে যেখানে খুশি ভ্রমণ করতে পারে। তাকে চেয়ারে বসতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে পুলিশ অফিসারের ঘরময় পায়চারি করছিল, আর মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল এমন ভংগীতে আন্দোলিত করছিল যেন কোনো নাচের মহলা দিতে শুরু করেছে।

এ পর্যন্ত জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর গুপ্তচরদের জন্য আমেরিকান নাগরিক-দের পাশপোর্ট চুরি বা অন্য কোন উপায়ে হস্তগত করে কাজে লাগাতো। ব্রিকাউয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেল তার ব্যতিক্রম। ওর পাশপোর্ট জাল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আসল আমেরিকান পাশপোর্টে যেমনটী থাকে তার বদলে ওর পাশপোর্টে ঈগলের থাবাগুলো উল্টোদিকে ফেরানো আর লেজের দিকে দু-একটী পালক কম ছিল। এসিড পরীক্ষায় নকল পাশ-পোর্টের কাগজও ভিন্ন বলে প্রকাশিত হলো। ব্রিকাউয়ের পরিচয় এর পর প্রকাশ হতে আর বিলম্ব হলো না। ১৯০৮ সাল থেকে আমেরিকায় ছিল সে। ফন প্যাপেনের সংগে পরিচিত হবার পর সে জার্মানীতে যায়। তারপর এণ্টোয়ার্পের গুপ্তচর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সুশিক্ষিত হয়ে সে আসে ইংল্যাণ্ডে। অন্যান্য গুপ্তচরদের মত ব্রিকাউও ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের মধ্যে গোপন তথ্যাদি প্রচ্ছন্ন রেখে দিত।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নির্জন সেলে বন্দী-দশার মধ্যে থেকে ব্রিকাউয়ের অবশিষ্ট মনোবল লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা ছিল লিজি হ্বারথেম বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছে ওকে। সারা জীবনের জন্য তার দণ্ডভোগ হতে পারে শুনে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে সে

জিজ্ঞাসা করেছিল, তাকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে না কেন? আরেকবার জিজ্ঞাসা করেছিল, দণ্ড কি মৃত্যু ?

এই সময় থেকে সে অত্যন্ত মনঃপীড়া ভোগ করতে থাকে। অপরাধের সব কথা স্বীকার করতে সে উৎসুক হয়ে ওঠে। পুলিশ তার সম্বন্ধে তদন্ত করে যা জেনেছিল তাছাড়া ব্রিকাউ এর আগে কোনো স্বীকারোক্তি করে নি।

ষ্টেটিনে তার বৃদ্ধা মাতার কথা ভেবে সে আকুল হয়ে উঠেছিল। অপরাধের লিখিত একটা স্বীকারোক্তি দিয়ে সে মনের দুর্বহ পীড়া লাঘব করার চেষ্টা করে।

ওল্ড বেইলী কোর্টে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে হাইকোর্টের তিনজন জজের সমক্ষে বিচার কার্য চলে। ব্রিকাউয়ের প্রাণদণ্ড ও লিজি হ্বার-থেমের দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রায় প্রকাশের পাঁচ সপ্তাহ পরে ২৬শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের টাওয়ারে ব্রিকাউয়ের মৃত্যুর দিন নির্দিষ্ট হয়। মধ্যবর্তী দিনগুলিতে ব্রিকাউয়ের জীবনীশক্তি ক্রমশ লোপ পায়। কারাকর্তৃপক্ষ তাকে সুস্থ রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়। শেষের দিন প্রভাতে ওকে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যা থেকে তোলা হয়। ভয়ে উত্তেজনায় সে কাঁপছিল তখন। রাইফেলের অগ্নিবর্ষণের পূর্ব মুহূর্তে ওকে একটা হেঁচকি তুলতে দেখা গিয়েছিল। চিকিৎসকদের মতে বুলেট ওর দেহস্পর্শ করবার পূর্বেই তার হার্টফেল হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে জার্মানীর যেসব গুপ্তচর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ফার্নাণ্ডো বুসম্যানের জন্য দুঃখবোধ হওয়া স্বাভাবিক। ফার্নাণ্ডো ভদ্রঘরের ছেলে। ড্রেসডনের কোনো এক ধনী সাবান প্রস্তুত-কারকের কন্যাকে বিয়ে করার পর শ্বশুরের অর্থানুকূল্যে বিমান-বিদ্যা শিখতে থাকে। ফার্নাণ্ডোর কোনো অর্থাভাব ছিল না। বেহালা বাজানোয়

দক্ষতা ও খ্যাতি ছিল। জার্মান বংশে জাত হলেও তার বাবা ছিলেন ব্রেজিলের নাগরিক। তার ধমনীতে ল্যাটিন রক্ত প্রবাহিত হতো। ফার্নাণ্ডোর প্যারীতে জন্ম, বাল্যকাল ব্রেজিলের জার্মান ইস্কুলে। ফার্নাণ্ডো নিজেই একটা এরোপ্লেন তৈরী করেছিল। ১৯১১ সালে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ওর পরীক্ষা-কার্য চালাবার সুবিধা হতে পারে ভেবে ইসির বিমান-ক্ষেত্রটী ছেড়ে দিয়েছিলেন। লড়াই আরম্ভ হবার আগে বছর তিনেক ধরে সে ইউরোপ ভ্রমণ করেছিল। লড়াই শুরু হলে পর সে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের সংস্পর্শে আসে। স্পেন, জেনোয়া, হামবুর্গে ঘুরতে হয় ওকে। পরের বছর সে বার্সিলোনা, মাদ্রিদ, ফ্লাসিং, এণ্টোয়ার্প ও রটারডামে যাতায়াত করে। ফার্নাণ্ডো বুসম্যানের মত একজন শিল্পী ও এঞ্জিনিয়ারের পক্ষে ব্যবসায়ী পর্যটকের ভেক নেওয়া একান্ত ভুল হয়ে ছিল। কারণ বুসম্যানের মধ্যে ব্যবসায়ীর সাদৃশ্য এতটুকুও ছিল না। তার বেশবাস, আচার ব্যবহার ও কথোপকথনের ধারা যথেষ্ট পরিমার্জিত ছিল। জাল ছাড়পত্র নিয়ে সে যখন লণ্ডনের হোটেলে আসে, তখন তার হাতে প্রিয় বেহালাটীও ছিল। কিছুদিন সে ব্রিক্সটনের লাবার্গ রোড ও সাউথ কেনসিংটনে বাড়ী ভাড়া নিয়ে ছিল। পোর্টসমাউথ ও সাউদাম্পটনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল। দুর্ভাগ্যবশত তার পুঁজি এইসময় শূন্য হয়ে এলে হল্যাণ্ডে টাকা পাঠাবার অনুরোধ পাঠায়। সেসময়ই সাউথ কেনসিংটনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন সে কপর্দকশূন্য। পুলিশের কাছে ফার্ণাণ্ডো বলেছিল পনির, কলা, আলু, সেফটি রেজর ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সে ইংল্যাণ্ডে এসেছে। ফ্রান্সেও নাকি পিকরিক এসিড, কাপড় ও রাইফেল বিক্রি করেছে। তাদের কোম্পানি (এবারও সেই ডায়ার্কস এণ্ড কোং) সারা ইউরোপে বিভিন্ন জিনিষ-পত্রের যে ব্যবসা খুলেছে তা নাকি অতুলনীয়। কিন্তু

ডায়ার্কস এণ্ড কোং যে কেবলমাত্র সিগারের ব্যবসা করে ও লণ্ডনেরই একটা ঘরে তাদের অফিস রয়েছে (রুস ও জ্যানসেনের বিবৃতি অনুযায়ী), একথা ওকে জানাতেই ফার্নাণ্ডো স্তম্ভিত হয়ে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করলে না।

ওর পাশপোর্টও ছিল জাল। রটারডামের জার্মান গুপ্তশিক্ষা বিদ্যালয়ের হস্তলিপি বিশারদ ও শিক্ষক ফ্লোরেস পাশপোর্টটা লিখে দিয়েছিল। এ ছাড়া ওর কাছে ছিল রটারডামের জার্মান কনসাল জেনারেল, হল্যাণ্ডের জার্মান মিলিটারী এ্যাটাচি, ও জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের গুপ্তচর সংগ্রাহক দুজন কর্মচারীর প্রত্যেকের একখানি করে চিঠি। ব্রিকাউ ও লিজি হ্বারথেমের সংগে ওরও বিচার চলেছিল, ব্রিকাউয়ের মত ওর প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। দণ্ডাদেশ পাবার পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টীতে বেহালাই তার একমাত্র সংগী হয়ে ওঠে। মৃত্যুর আগের দিনেও লণ্ডন টাওয়ারের উর্ধ্বে গভীর রাত্রির আকাশ তার বেহালার করুণ মূর্ছনায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। শেষের মুহূর্তে ফার্নাণ্ডো চোখে ব্যাণ্ডেজ নিতে অস্বীকার করে হাসিমুখে রাইফেলের সম্মুখে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল।

• ব্রিটেনে জার্মানীর বিভিন্ন দেশীয় গুপ্তচর

অগাস্টো এলফ্রোডো রোগিন

আর্নস্ট ওয়ালডেমার মেলিন

রবার্ট রোজেনথাল

লুডোভিকো হারভিচ-ই-জেগুার

ইগ্নাটিয়স টিমোথি ট্রিবিৎস লিংকন

আরভিং গাই রিয়েস

কোর্তিনে ছ রিসব্যাচ

এলবার্ট মেয়ার

এলফ্রেড হ্যাকন

জোস্ ছ পত্রোসিনিও

এডল্‌ফো গুয়েরিরো

লিওপোল্ড ভিইয়েরা

জোসেফ মার্কস ইত্যাদি

বৃটেনে জার্মানীর বিভিন্ন দেশীয় গুপ্তচর

জার্মান গুপ্তচরদের ব্যর্থতার পর জার্মানী দক্ষিণ আমেরিকা থেকে গুপ্তচর সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় জার্মানীর বিরাট উপনিবেশগুলি গুপ্তচর সংগ্রহের উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছিল। ফার্নাণ্ডো বুসম্যানের গ্রেপ্তারের কয়দিন পরে ১৯১৫ সালের জুন মাসে, ইংল্যাণ্ড থেকে কোনো ব্যক্তি রটারডামের উদ্দেশ্যে দুটো পোষ্ট-কার্ডে লিখেছিল যে সে ইংল্যাণ্ডে এসে পৌছেছে ও কাজ করতে প্রস্তুত আছে। পোষ্টকার্ড দুটীতে এডিনবরার ছাপ ছিল। স্কটল্যাণ্ডের পুলিশ তৎপরতাব সংগে লচ্ লমণ্ডে উরুগুয়েবাসী জনৈক যুবককে আটক করেছিল। লোকটী তার নাম জানিয়েছিল অগাষ্টো এলফ্রেডো রোগিন। লোকটার চেহারা মোটেও জার্মানদের মত নয় : রংটা পোড়া, ফিটফিটে বেঁটে চেহারা। জেরার উত্তরে কৃষির সরঞ্জাম ও পশ্বাদি ক্রয়, সেই সংগে স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে লচ্ লমণ্ডে এসেছে বলেছিল। লোকটীর অনর্গল ইংরেজী বলার ক্ষমতা ছিল।

গুপ্তচর হিসেবে সে নির্বোধ। কিংস ক্রস থেকে উত্তরে আসার সময় সে সহযাত্রীদের এত বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল যে সবাই উত্যক্ত ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। এডিনবরার পুলিশ রেজিষ্ট্রারে নাম লেখার সময় তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। সে সময় সে বলেছিল লচ্ লমণ্ডে মাছ ধরার জন্য এসেছে। লচে সে সময় টর্পেডো সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক কাজ চলছিল। এ সময়ে বিদেশী ব্যক্তির উপস্থিতির ফলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ওর জিনিষপত্রের মধ্যে অদৃশ্য কালির বোতল পাওয়া যায়। বিচারে অভিযুক্ত হবার পর সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে আর্নষ্ট ওয়ালডেমার মেলিন নামে ৫০।৬০ বছর বয়সের এক সুশিক্ষিত সুইডিশ ভদ্রলোক এসেছিলেন। এককালে তিনি গোটেনবার্গের কোনো জাহাজ কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পরে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় পৃথিবী পর্যটন শুরু করেন। মাঝে মাঝে লণ্ডন, প্যারী, কোপেন-হেগেনে চাকরী করেন। লড়াই যখন শুরু হয় তখন তিনি হামবুর্গে। তখন কোনো চাকরী ছিল না তাঁর। এণ্টোয়ার্পে কাজ পাওয়া যেতে পারে শুনে তিনি সেখানে যান। জার্মান গুপ্তচর সংগ্রাহকরা তখন সেখানে ইংরেজী ভাষাভাষী লোকের সন্ধান করছিল। মেলিনকে আবিষ্কার করতে তাদের দেরী হলো না। প্রথমটা তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু কপর্দকশূন্য অবস্থায় বেশীদিন তাঁর পক্ষে অর্থলোভ সম্বরণ করে থাকা সম্ভবপর হয়নি। ব্রেসেল ও এণ্টোয়ার্পে শিক্ষা সমাপ্তির পর রটারডামে তাঁকে পাশপোর্ট ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা দেওয়া হয়। এরপর তিনি হ্যাম্পষ্টেডের এক বোর্ডিং হাউসে এসে ওঠেন। পরিচয় দেন ডাচ-ব্যবসায়ীরূপে—জার্মান ডুবোজাহাজের শয়তানীতে ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় কোনো জাহাজ কোম্পানীতে চাকুরী খুঁজছেন। পুলিশ গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিল তাঁর ওপর। মেলিন প্রথম দিকে সংবাদপত্রের মার্জিনে লিখে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আকস্মিক তল্লাসির ফলে তাঁর কাছে অদৃশ্য কালির সরঞ্জাম, সংকেতলিপির জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষার অভিধান ও পর্যটকদের গাইডবুক পাওয়া যায়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

নিতান্ত আকস্মিকভাবে একজন জার্মান এজেন্ট ধরা পড়েছিল ইংল্যাণ্ডে। এর বেলায় দেখা যায় জার্মানরা পুরোনো আসামীদেরও শত্রুর দেশে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে গ্রহণ করেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম। কোপেনহেগেনের ডাকবিভাগের এক কর্মচারী বার্লিনের একটা চিঠি ভুল

করে লণ্ডনের জন্য নির্দিষ্ট ব্যাগে পুরে দিয়েছিল। চিঠিতে জার্মান ভাষায় লেখা ছিল লে'ক পেটেণ্ট গ্যাস-লাইটার বিক্রেতার ছদ্মবেশে সামরিক ও নৌ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের আশায় লণ্ডনে যাচ্ছে। সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠিটা পাবার পর ব্রিটিশ গোয়েন্দাপুলিশ বুঝতে পারলো যে গ্যাস-লাইটার বিক্রির অছিলায় আরেকটা গুপ্তচরের আগমন হচ্ছে। কিছুকাল ধরে অনুসন্ধানের পর জানতে পারা গেল রবার্ট রোজেনথাল নামে এক যুবক স্কটল্যাণ্ডে গ্যাস-লাইটার নিয়ে ঘোরাঘুরির করার পর নিউ ক্যাসেল থেকে কোপেনহেগেনগামী ষ্টিমারে উঠে বসেছে। আর একটা ঘণ্টা পরেই সে তিন মাইলের সীমানা পেরিয়ে ব্রিটিশ আইনের গণ্ডী অতিক্রম করতে সমর্থ হতো। লোকটা অভিযোগ বেমালুম অস্বীকার করেছিল। তার কাছে চিঠিটার উল্লেখ করাতে সে জানালো কোপেন-হেগেনে কস্মিনকালেও সে থাকে নি। সে জার্মান নয় আর যে হোটেল থেকে চিঠিটা লেখা হয়েছিল তার নাম কোনোকালেও শোনে নি সে। তার হস্তাক্ষর চিঠির লেখার সংগে মিলে যাবার পর চিঠিটা তাকে পড়ে শোনাতেই সে নাটকীয় ভংগীতে চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো সামরিক কায়দায়। বল্লে, আমি জার্মান সৈনিক, সমস্ত কিছু স্বীকার করছি। রোজেনথাল কোনোকালেও সৈনিক ছিল না। অল্পবয়সে জালিয়াতির অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়। যুদ্ধ বাধার সময় সে ছিল হামবুর্গে। তখন সে আমেরিকার রিলিফ কমিশনে কাজ পেয়েছিল। এর পর সে গুপ্তচর বৃত্তি অবলম্বন করে। বিচারে তার ফাঁসি হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডে এর পরে যে গুপ্তচরটা ধরা পড়ে, সে হচ্ছে একজন পেরু-ভিয়ান। লোকটার নাম লুডোভিকো হারভিচ-ই-জেণ্ডার। লোকটা সত্যিকারের ব্যবসায়ী ছিল। বিদ্যাও কিছুটা ছিল তার। ১৯১৬ সালের

আগষ্ট মাসে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ইউরোপ যাত্রার পথে সে আসে আমেরিকায়। সে সময়ে সে পেরুতে অনেকগুলি ইউরোপীয় কোম্পানীর প্রতিনিধি। মনে হয় নরওয়েতে আসার পরই জার্মান গুপ্তচরদের সংস্পর্শে এসেছিল সে। জার্মানীর গুপ্তচর বিভাগ তখন ইংল্যাণ্ডে গুপ্তচরের কাজ করতে ইচ্ছুক যোগ্যতম ব্যক্তিদের প্রচুর বেতন দিতে প্রস্তুত ছিল। জেণ্ডারের মত ব্যবসায়ীকে নিয়োগ তা প্রমাণিত করেছে। সেই সময় কেবল সেন্সর লক্ষ্য করছিলেন যে ক্রিশ্চিয়ানাতে প্রচুর পরিমাণে সার্ডিনের অর্ডার পাঠানো হচ্ছে। বছরের সেই সময়টা সার্ডিন টিনজাত করার উপযোগী ছিল না। তাই জেণ্ডারের মত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর পক্ষে উপর্যুপরি অর্ডার প্রেরণ সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল। যে ব্যক্তিটীর কাছে অর্ডার প্রেরিত হচ্ছিল তার পরিচয় জানার জন্য নরওয়েতে অনুসন্ধান করা হয়। জানা গিয়েছিল সে ব্যক্তি সত্যিকার ব্যবসায়ী নয় —জার্মান কনসালের সংগে হামেশাই দেখা করে। সার্ডিনের অর্ডারের মধ্যে সংকেত প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভেবে বিশেষজ্ঞরা রহস্যভেদ করতে প্রস্তুত হলেন। জেণ্ডারকে নিউ ক্যাসলে গ্রেপ্তার করা হলো। সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে যায়। তার ধারণা ছিল পুলিশ তার সম্বন্ধে কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই আত্মবিশ্বাসের সংগে জানিয়েছিল যে নিউ ক্যাসল, গ্লাসগো, এডিনবরায় সে ভ্রমণ করেছে, যদিও এ সমস্ত স্থানে কোনো ব্যবসা-কার্য সম্পন্ন করেনি। টিনজাত সার্ডিনের অর্ডার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জেণ্ডার দৃঢ়তার সংগে বলেছিল, ওর মধ্যে সন্দেহ করার কিছুই থাকতে পারে না। বিশেষজ্ঞরা হেসে উঠেছিলেন ওর কথায়। কোর্ট-মার্শাল কর্তৃক বিচারের সময় জেণ্ডার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কয়েকজন সাক্ষী আনাবার দাবী করে। সাক্ষী আনার ব্যাপারে প্রচুর ব্যয় ও আট মাস সময় অতিবাহিত হয়। সাক্ষীরা

ওর অনুকূলে কিছুই বলে নি। বিচারে ওর চরম দণ্ড হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে শেষ নিহত গুপ্তচর সে ই।

যুদ্ধের সময় শত্রু-ব্যূহের ঠিক পশ্চাতে থেকে সংবাদ আহরণ ও প্রেরণ করাই হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তির সার্থকতা। এজন্য শত্রুর দেশে গুপ্তচরের পক্ষে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত পদে অধিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। কিম্বা বিরুদ্ধপক্ষের এমন একজনের সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন, যে নৌসংক্রান্ত বা সামরিক গুপ্ত তথ্যাদি জানে। যুদ্ধ চলার সংগে জার্মানরা ক্রমশ উৎসুক হয়ে উঠেছিল গ্রেট ব্রিটেনের মনোবল কোন্ পর্য্যায়ে আছে জানতে। দুর্ভাগ্যক্রমে ওরা বিমানাক্রমণ ও ডুবোজাহাজী হামলার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভুল রিপোর্ট পেয়েছিল। ওদের ধারণা ছিল ব্রিটিশজাতির সহনশক্তি ক্রমশ ভেঙে পড়ছে, তাই ওদের আগেই ব্রিটিশরা রণক্লান্ত হয়ে পড়বে।

প্রথম যুদ্ধকালে ব্রিটেনের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে যে কজন জার্মানদের ক্রীড়াপুত্তলী হয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, সম্ভবত ইগ্নাটিয়স টিমোথি ট্রিবিৎস লিংকনই তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই হাংগেরিয় ইহুদি ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে সাংবাদিক, চার্চ অব ইংলণ্ডের যাজক ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৫ সালে দানিয়ুব নদীর তীরে পাকস্ নামক স্থানে এর জন্ম। এর পিতা সচ্ছল ব্যবসায়ী ছিলেন—জাহাজ তৈরীর ব্যবসা ছিল তাঁর। ইগ্নাটিয়স জুইস চার্চে শিক্ষা গ্রহণ করে ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিশ বছর বয়সে লণ্ডনে এসে লিংকন আরো সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। হাংগেরীতে ফেরার পর পিতাপুত্রে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ১৮৯৯ সালে ইগ্নাটিয়স হামবুর্গের লুথেরান চার্চে যোগদান করেন। পরে ইহুদিদের প্রেসবিটেরিয়ান মিশনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ক্যানেডায় আসেন। মিশনটী চার্চ অব ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হলে তিনি তাঁর কর্মপন্থা পরিবর্তন করেন। ইউরোপে

প্রত্যাবর্তন করে ইংল্যাণ্ডের কোনো স্থানে কিউরেসি'র জন্য দরখাস্ত করেন। ক্যানেডায় তাঁর বাগ্মীতার বিশেষ খ্যাতি রটে ছিল। ট্রিবিৎস এরপর কেণ্টের এ্যাপ্‌লডোর গীর্জার কিউরেট নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে কাজে তাঁর বিশেষ স্থবিধা না হওয়ায় লণ্ডনে চলে এসে তিনি সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৬ সালে ট্রিবিৎস লিংকন মিঃ রাউনট্রির সংগে পরিচিত হয়েছিলেন। উপযুক্ত বিবেচনা করে তিনি তাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। রাউনট্রি এই সময় উদারনীতিক নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন। ফলে লিংকনও লিব্যারাল পার্টির সংগঠকদের সংগে অন্তরংগ হয়ে ওঠেন। অবশেষে নির্বাচনে পার্টির মনোনয়ন নিয়ে ডারলিংটন কেন্দ্রে ইউনিয়নিষ্ট প্রার্থীর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেন।

পার্লামেণ্টের সদস্য লিংকনের ওপর ইউরোপীয় মহাদেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ কমিটির ভারার্পিত হয়েছিল। এই সময় থেকেই তিনি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে নিজের সম্ভাবনাময় বৃহত্তর ভবিষ্যতের আশায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু যুদ্ধ বেধে উঠলে ট্রিবিৎস লিংকনের ভাগ্যতারকা ক্রমশ বিরূপ হয়ে ওঠে। পার্লামেণ্টের পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হবার পর লিংকনেব আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তখনো পর্যন্ত তাঁর মনে ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে কোনো বিরূপ ধারণার উদয় হয় নি। লিংকনকে হাংগেরিয় ও রুমানীয় পত্রাদির সেন্সর অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছিল। গোড়ায় এ কাজ তিনি ভালোভাবে সম্পন্ন করলেও সহযোগীদের সংগে পরে বনিবনার অভাব ঘটায় ক্রমশ ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন।

ইংল্যাণ্ডের গোয়েন্দাবিভাগে প্রবেশের চেষ্টাই ওর প্রথম বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ। লিংকন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জার্মান নৌবহরকে তিনি

প্রলোভন দেখিয়ে উত্তর সমুদ্রে আনতে সক্ষম হবেন, ফলে ব্রিটিশরা তা সহজেই ধ্বংস করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি হল্যাণ্ডে গিয়ে জার্মান কন্সালের কাছে কাজ নেবার প্রস্তাব করবেন জানিয়েছিলেন। লিংকনের আসল উদ্দেশ্য অন্যরকম বুঝতে পেরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ওর আবেদন নামঞ্জুর করে ছিলেন। তা সত্ত্বেও লিংকন পাশপোর্টের সাহায্যে ১৮ই ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে রটারডামে যান। তারপর জার্মান কনসালের সংগে হৃদ্যতা স্থাপন করে তার কাছ থেকে কতকগুলি মূল্যহীন তথ্য সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে ঢোকার চেষ্টা করেন। ব্যর্থকাম হবার পর তিনি আমেরিকায় পাড়ি দেন। ইতিমধ্যে সাতশো পাউণ্ডের এক হুণ্ডিতে রাউনট্রির স্বাক্ষর জালের ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত শুরু হলে লিংকনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯১৬ সালে আমেরিকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, বিচারে তিন বৎসরের কারাদণ্ড হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি বুদাপেস্তে যাত্রা করেন।

আরভিং গাই রিএস নামের এক জার্মান আমেরিকানকে জার্মানরা সংগ্রহ করেছিল নিউ ইয়র্কে। ব্যক্তিগত জীবনে লোকটা ফিল্ম-অপারেটর হলেও লিভারপুলে এসেছিল শস্য-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে। ষ্ট্র্যাণ্ডের এক হোটেলে কয়েক দিন কাটিয়ে রিএস নিউ ক্যাসল্, গ্লাসগো ও এডিনবরায় কয়েকজন শস্যোৎপাদকের সংগে দেখা করেছিল। অন্যান্য গুপ্তচরদের মত সেও সত্যিকার কোনো ব্যবসায় করে নি। পক্ষকাল উত্তরে কাটাবার পর লণ্ডনে আসে ২০শে জুলাই। অন্যান্য গুপ্তচরদের সংগে একটা বিষয়ে তার মিল ছিল। যে কটা ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি-পত্রাদি লিখেছিল, তার প্রত্যেকটারই নকল রেখেছিল। দুর্ভাগ্যবশত তার পকেটের টাকা ফুরিয়ে এসেছিল। সেন্সর কর্তৃপক্ষ একদিন হল্যাণ্ড থেকে তার নামে প্রেরিত একখানা চিঠির মধ্যে এমন একটা টাকার

অংকের উল্লেখ দেখতে পেলেন যা অন্যান্য গুপ্তচরদের প্রতি প্রদত্ত টাকার অংকের সমান। রিএস আমেরিকান পাশপোর্ট ব্যবহার করছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের অনুরোধে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ওর কাছ থেকে সেটা পরীক্ষা করবার জন্য প্রত্যাহার করে নিলেন। পরীক্ষায় সেটা জাল বলে প্রমাণিত হলে ১৯শে আগষ্ট রাত্রে রিএস হোটেলে যে সময় শুতে যাচ্ছে সেই সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রথম জেরার সময় রিএস তার আসল নাম বলে নি। তবে তার গতিবিধি সম্বন্ধে খোলাখুলি স্বীকার করেছিল। আমেরিকানরা ওর কাছ থেকে জাল ছাড়পত্রটা কেড়ে না নিলে সে নাকি কোপেনহেগেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো। তার কাগজপত্রের মধ্যে রটারডাম থেকে লেখা একখানি চিঠি পাওয়া যায়। তাতে ওকে ইংল্যাণ্ডের অনুসন্ধান-কার্যের ফলাফল জানাবার জন্য রটারডামে কোনো এক ব্যক্তির সংগে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাকে গুপ্তচর বলে নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত করা গেলেও সে যে গোপন তথ্য প্রেরণ করেছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ৪ঠা অক্টোবর ওর বিচার শুরু হয়। গুপ্তচরের প্রাপ্য চরম দণ্ডেরই আদেশ হয় ওর প্রতি।

কোর্ত্তিনে গু রিসবাচ নামক ব্রিটিশ প্রজাটী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর চর নিযুক্ত হয়েছিল। বার্লিন থেকে সুশিক্ষিত হয়ে লোকটা জুরিখ, পরে প্যারীতে আসে। সে সময় সে নিজের পরিচয় দিয়েছিল স্বাস্থ্যের অজুহাতে জার্মানীর বন্দীশালা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রিটিশ নাগরিক বলে। ২৭শে জুন ফোকষ্টোনে উপস্থিত হবার পর সে নির্বাধ স্বাধীনতায় সারা ইংল্যাণ্ডে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিল।

জুরিখের এক ব্যক্তির ঠিকানায় পাঠাবার জন্য ডাকঘরে আসা দুটো গান সন্দেহক্রমে সেন্সর আটক করেছিলেন। গান দুটীর নীচে প্রেরকের

নামঠিকানা লেখা লেখা ছিল : জ্যাক কামিংস, প্যালেস থিয়েটর, লণ্ডন। এ ঠিকানায় ঐ নামের কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। গান দুটোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন সংকেতের রহস্যোদ্ধার করার পর এটুকু বোঝা গেল প্রেরক ইংল্যাণ্ডে এসে সমর-প্রচেষ্টার যেটুকু দেখেছে তারই বর্ণনা দিয়েছে। সবিশেষ অনুসন্ধানের পর রিসবাচ ধরা পড়ে ও বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ যুদ্ধ-বন্দীদের ওপরও জার্মানাসিক্রেট অর্গানাইজেশনের শ্যেন দৃষ্টি ছিল। সামাজিক, অসামাজিক ও সামরিক সকল স্তর থেকেই জার্মানীর গোয়েন্দা-বিভাগ গুপ্তচর সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল। আজ পর্যন্ত যতগুলি গুপ্তচরের কথা জানা গেছে, তাদের শতকরা ৭৫ ভাগই জার্মান নিযুক্ত। এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার জন্যই মিত্রপক্ষ জার্মান চরদের কাহিনী ফলাও করে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। জার্মানীতে যুদ্ধবন্দী ব্রিটিশ অসামরিক এমন অনেক ব্যক্তি ছিল, যারা আইনত ব্রিটিশ নাগরিক হলেও রক্তসম্পর্কে ছিল জার্মান। তাদের মধ্য হতে গুপ্তচর সংগ্রহের চেষ্টা চলেছিল এবং জার্মান গুপ্তচর বিভাগ এ বিষয়ে সফলও হয়েছিল। একজন ইহুদির কাহিনী এ সম্পর্কে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। লোকটা জার্মান পিতার সন্তান। অতি শৈশব থেকে ইংল্যাণ্ডে থাকার ফলে অর্জন করেছিল ব্রিটিশ নাগরিকসত্ব। বিয়েও করেছিল ব্রিটিশ নারীকে। যুদ্ধের সূচনায় ব্যবসায়-সূত্রে জার্মানীতে থাকার সময় তাকে বন্দী করা হয়। প্রথমে তার আভ্যন্তরীণ মনোভাব সম্বন্ধে তার সংগী অন্য বন্দীদের মনে কোনো সন্দেহই হয় নি। পরে তার দু'চারটে অসংলগ্ন উক্তিতে ওরা সন্দিহান হয়েছিল। তার কাগজপত্র ঘেঁটে ওরা জার্মান সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত তার লেখা মিত্রশক্তি, বিশেষ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে ভরা কয়েকটা প্রবন্ধের

নকল দেখতে পেয়েছিল। তার লেখা আরো একটী চিঠি পড়ে ওরা জানতে পারলো, লোকটা জার্মান গভর্নমেণ্টের কাছে ইংল্যাণ্ডে বোমাবর্ষণের সময় জার্মান জেপেলিনের পথপ্রদর্শক রূপে যাবার প্রস্তাব করেছে। যুদ্ধের আগে ইংল্যাণ্ডের পথঘাটগুলিতে ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে মোটরে করে হামেশাই তাকে ঘুরতে হওয়ার দরুন ভূভাগের মানচিত্র নাকি তার নখদর্পণে ছিল।

কাগজপত্রগুলি আবিষ্কৃত হবার আগে কয়েকদিনের জন্য লোকটীকে কারাগারে দেখতে না পাওয়ায় সংগীরা ভেবেছিল সে পলায়ন করেছে, পরে কাগজপত্রাদি থেকে ওর সঠিক মনোভাব জানার পর জার্মানরাই যে ওকে মুক্তি দিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। সমস্ত বিষয় জেনে সংগীরা কাগজপত্রগুলি যে কোনো উপায়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তা স্যর বেসিল টমসনের কাছে পৌছে দেবার মনস্থ করলো। এর কয়েক সপ্তাহ পরে কোনো দুর্জ্ঞেয় কারণে জার্মানরা লোকটীকে ফের কারাগারে প্রেরণ করেছিল। বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত সংগীদের কাছ থেকে এবার সে একটুও সহৃদয়তা লাভ করে নি। ফলে তার জীবন সেখানে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে। পুনর্বার সে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর তাকে দেখা যায় ইংল্যাণ্ডে, স্যর বেসিল টমসনের সামনে।

স্যর বেসিল যখন তার লেখা কাগজপত্র ও চিঠিগুলোর কথা উল্লেখ করলেন, সে কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারপরই সাফাই গাইতে শুরু করে দিল। নিতান্ত হাস্যকরভাবে সে বল্ল, জেপেলিনগুলোর সংগে পথপ্রদর্শক রূপে আসার প্রস্তাবটীকে বিপরীত-ভাবে গ্রহণ করলে সঠিক মর্মটা পাওয়া যাবে অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীতে বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ বিমান বহরকে পথ দেখিয়ে আনা।

স্যর বেসিল লোকটাকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তরীণ করে রাখেন।

স্যর বেসিলের মনে জঘন্য রেখাপাত করেছিল এ্যালবার্ট মেয়ার, একজন ইহুদি। যেসব অল্পবয়সী ছোকরারা মেয়েদের সংগে মেশামেশি করে স্রেফ ফুর্তির জন্য, কাপ্তেনীর উদ্দেশ্যে বাড়ী ভাড়া করে বাড়ীওলীদের পয়সা দেয় না, কর্মস্থলেও মালিকদের প্রবঞ্চনা করতে যাদের বাধে না, মেয়ার ছিল তাদেরই একজন। সেন্সর কর্তৃপক্ষ অদৃশ্য কালিতে লিখিত একখানি চিঠি আটক করেছিলেন—তাতে প্রেরকের মিথ্যা নামঠিকানা লেখা দেওয়া ছিল। গোয়েন্দাপুলিশ চিঠিটা চেপে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের কয়েক হপ্তায় এই রকমের একই হস্তাক্ষরে লেখা প্রেরকের মিথ্যা নামঠিকানাসম্বলিত চিঠি সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছে এসেছিল। লেখককে সনাক্ত করা না গেলেও এটুকু বোঝা গিয়েছিল সে বিদেশী কেউ হবে, লণ্ডনের কোথাও না কোথাও রয়েছে। দীর্ঘ অক্লান্ত অনুসন্ধানের পর একটা ভাড়াটে বাড়ী থেকে এ্যালবার্ট মেয়ারকে ধরা হলো। আজ এ বাড়ী, কাল ও বাড়ী, এইভাবে এইভাবে ক্রমাগত বাড়ীবদল করে চলেছিল ছেলেটা, আর বাড়ীওলীদের ক্রমাগত ধাপ্পা দিয়ে আসছিল যে বিদেশে তার পিতামাতার কাছ থেকে টাকা এলেই ভাড়া মিটিয়ে দেবে। গুপ্তচরদের বিশিষ্ট ধরণের জীবনযাত্রা ওর বেলাতেও দেখা গিয়েছিল অর্থাৎ পকেটে পয়সা থাকলে নামকরা হোটেলে খেয়ে পয়সা ফুরুলে পরিচিত কারুর কাছ থেকে খাবার ধার করতো। মেয়ার তার কর্তৃপক্ষকেও ধাপ্পা দিয়েছিল—জার্মানদের অনেক মিথ্যা খবর সরবরাহ করেছিল সে। চিঠির লেখার সংগে তার লেখা যখন অবিকল মিলে গেল, তখন সে বলেছিল, চিঠিগুলো হচ্ছে ওর তথাকথিত কোনো বন্ধুর কারসাজি, তারা ওর হাতের লেখাটা পর্যন্ত নকল করেছে! ওর কাছ থেকে যখন অদৃশ্য কালিও পাওয়া গেল,

তখন জানালো, বন্ধুরাই ওর কাছে ওটা ফেলে দিয়ে গেছে। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

দণ্ডাজ্ঞার পরের দিনগুলিতে মেয়ার শান্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়েছিল। শেষের দিনে সেল থেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সে গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করেছিল। কিন্তু রাইফেলের সীমানার মধ্যে এসে গান বন্ধ করে সে সকলকে অশ্লীল গালি দিতে আরম্ভ করলো। জোর করে তাকে চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়। চোখের ব্যাণ্ডেজ সে সরিয়ে দিয়েছিল। গুলি করার পর ছটফট করতে করতে তার মৃত্যু হয়।

গুপ্তচর এলফ্রেড হাকনের চরিত্রটিও অদ্ভুত। এই তরুণ নরওয়ে-বাসীকে ব্রিটিশ পুলিশ ১৯১৭ সালের ২৪শে মে গ্রেপ্তার করে। ছেলেটার মধ্যে অনেক গুণ ছিল—উপন্যাস লিখতে পারতো, ফিউচারিষ্ট ঢংয়ে ছবি আঁকতো, পত্র-পত্রিকার জন্য গল্প-কবিতা রচনা করতো। আমেরিকায় নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসে ছেলেটা। তারপর ১৯১৬ সালের শরৎকালে নরওয়েতে ছবি বিক্রির চেষ্টা করার সময় ওর আলাপ হয়ে যায় ল্যাভেণ্ডেল নামক জার্মান চিত্রকর ও হার্দার্ন নামক জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীর সংগে। ওর দুরবস্থার কথা শুনে হার্দার্ণ ওকে ইংল্যাণ্ডে জার্মান এজেন্টরূপে যাবার পরামর্শ দেয়। হাকন প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিয়েছিল প্রথমে। পরে সে ভাবলো নরওয়েজিয়ান কাগজের ইংল্যাণ্ডস্থিত সংবাদদাতার পরিচয় গ্রহণ করলে গুপ্তচররূপে তার ওপর কোনো সন্দেহ পড়বে না, তাই একটা কাগজের সংগে প্রবন্ধ পাঠাবার ব্যবস্থা করে সে চলে এলো ইংল্যাণ্ডে। কয়েক সপ্তাহ কিছুই সে করে নি। শুধু কয়েকটা প্রবন্ধ লিখে ফিরে গেল নরওয়েতে। এই সময় তার পকেট শূন্য হয়ে এসেছিল, জার্মান

গুপ্তচর প্রতিষ্ঠানও ক্রমশ তাকে চাপ দিতে আরম্ভ করলো। তাই পুনর্বার ইংল্যাণ্ড যাত্রা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। ১৭ই এপ্রিল ১৯১৭ তারিখে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়ে ট্যাভিষ্টক স্কোয়ারে একটা বাড়ীভাড়া নিলো সে। সেই বাড়ীর অপরাংশে এক ইতালিয়ান অধ্যাপক থাকতেন। ওর চালচলন দেখে অধ্যাপক ভদ্রলোকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। লোকটীকে জার্মানদের গুপ্তচর বলে তাঁর ধারণা এমন নিশ্চিত হয়ে ওঠে যে নিকটবর্তী থানায় তিনি খবর দেন। হাকনের পাশপোর্ট পরীক্ষা করার পর তাকে ইংল্যাণ্ডে পদার্পন করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যে সব চিঠি পত্র সে লিখে পাঠাতো তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কৃত না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ভাবলেন হাকন নিশ্চয়ই নূতন ধরণের কোনো অদৃশ্য কালি ব্যবহার করে। ওর ঘরে তল্লাসি করার সময় টেবিলের ওপর গলার কুলকুচির ঔষধের (থ্রোট গার্গল) একটা বোতল ছিল। সন্দেহক্রমে ওষুধটার একটুখানি নিয়ে পরীক্ষা করতেই দেখা গেল সেটা একধরণের অদৃশ্য কালি। এরপর হাকনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

তল্লাসির সময় পুলিশ ওর জিনিষপত্রের মধ্যে এমোনিয়ায় ভেজানো তুলো পেয়েছিল। সেটী ব্যবহৃত হতো কালির সংগে।

তদন্তে জানা গিয়েছিল হাকন দুটো কি তিনটে প্রবন্ধ লিখে প্রত্যেকটার জন্য দু পাউণ্ড করে দক্ষিণা পেয়েছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ব্যয়নির্বাহ করার পক্ষে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। সুতরাং তার সমস্ত ব্যয়নির্বাহ কি করে নিষ্পন্ন হতো তার কোনো সদুত্তরই দিতে পারে নি সে। পরে বিচলিত হয়ে সব কিছু স্বীকার করেছিল। তার মতলব ছিল হাসপাতাল (রেডক্রশ) জাহাজগুলি সামরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা খোঁজ নেওয়া। হাকন সম্ভবত জার্মানদের মূল্যবান তথ্যাদি পাঠাতে পারে নি।

তবে এক সময় সে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাব পশ্চিম রণাংগন পরিদর্শনের অনুমতি চেয়েছিল।

২৭শে আগষ্ট হাকনের বিচার আরম্ভ হয়। ওর উকিল বিবৃত করলেন ওর জীবনের কাহিনী, পিতামাতার অত্যধিক প্রশ্রয়ে চরিত্রভ্রষ্ট এক যুবকের ইতিহাস। পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন সবই চলেছিল ভালো। তাঁর মৃত্যুর পর মা ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যায় ব্যাকুল হয়ে বাধ্য হয়ে হাকন বেছে নিয়ছিল গুপ্তচরের জীবন। বিচারে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম হলেও পরে তা নাকচ করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কয়েক বৎসর পরে নরওয়ে গভর্ণমেণ্টের সংগে পরামর্শ করার পর ব্রিটিশ সরকার তাকে মুক্তি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডে জোস দ্য পত্রোসিনিও নামে এক ব্রেজিলিয়ান গুপ্তচরের আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পিতা ছিলেন একজন নামকরা নিগ্রো সাংবাদিক, ব্রেজিলের ক্রীতদাসদের মুক্তি-সংগ্রামে তাঁর অবদান ছিল অনেকখানি। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দেবার পর পোর্ট কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাসাবাদের সময় পত্রোসিনিও এমন একটা ভাব দেখায় যে তার সম্বন্ধে একটা প্রতিকুল ধারণা সহজেই বদ্ধমূল হয়ে যায়। চাপ দিতেই সে সমস্ত কথা স্বীকার করেছিল।

১৯১৩ সালে সাংবাদিকের কাজ নিয়ে সে যায় প্যারীতে। সেখানে থাকতে থাকতেই সে ব্রেজিলের রাষ্ট্রদূতের এ্যাটাচির পদে নিযুক্ত হয়েছিল। ১৯১৬ সালে তার চাকরীটা যায়—তখন সে আমষ্টারডামে, পকেট একেবারে খালি, অধিকন্তু বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত তার ঘাড়ে চেপেছিল একটী স্ত্রীরত্ন। ব্রেজিলে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হলেও পাথেয়-সংস্থানের ব্যাপারে সে ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠলো। এই

সময় সে জার্মান এজেন্টদের সংস্পর্শে আসে। অর্থাভাবে তার স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়ে উঠেছে জানতে পারে তারা। পত্রোসিনিওকে ব্রেজিলে ফিরে যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করতে বলে ওরা। তাকে বলা হয় তারা তার সংগে এমন এক ব্যক্তির আলাপ করিয়ে দেবে, যিনি তাকে প্রচুর উপার্জনের পন্থা বাৎলে দেবেন।

প্রস্তাবিত ভদ্রলোকটীর নাম লেভি, ব্রেজিলিয়ান বলে নিজের পরিচয় দিলেন। পত্রোসিনিও পর্তুগীজ ভাষায় তার সংগে কথা বলেই বুঝলো লোকটী আর যাই হোক ব্রেজিলিয়ান নয়। লেভি কৈফিয়ৎ দিলেন, তিনি ব্রেজিলিয়ান পিতার সন্তান। পত্রোসিনিও বল্লে, ব্রেজিলে আপনি কখনো থাকেন নি। কথাটা শুনে লেভি সপ্রশংসভাবে বলে উঠলেন, আপনি বেশ চতুর। আপনার মত লোকই আমি চাইছি। আসলে আমি সুইস। ইংল্যাণ্ডেযাবার জন্য আমাব একটী ব্রেজিলিয়ান পাশপোর্ট প্রয়োজন। এজন্যে আমি মোটা টাকা দিতেও প্রস্তত। পত্রোসিনিওর মুখের পানে তাকিয়ে গলা খাটো করে লেভি বল্লেন, আপনার অর্থাভাব চলছে। আপনাকে আমি হাজার হাজার পাউণ্ড উপার্জনের পথ দেখিয়ে দিতে পারি।

পত্রোসিনিওকে অধিকতর বিস্মিত করে লেভি জিজ্ঞাসা করলেন, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে আমার কাজকর্ম দেখতে আপনার আপত্তি আছে ?

সে কৌতূহলী হয়ে উঠতেই লেভি প্রস্তাব করলেন, হাজার হাজার পাউণ্ড রোজগার করতে চান তো ফ্রান্সে পরবর্তী আক্রমণ কোথায় শুরু হবে জানবার চেষ্টা করুন।

লেভির কথার মধ্যে কোথাও যেন সম্মোহন ছিল। পত্রোসিনিও নিজের অজ্ঞাতসারেই তার হাতের মধ্যে এসে পড়লো। ওর ঔৎসুক্য দেখে লেভি বল্লেন, আমি বার্লিন পুলিশের বিশেষ কর্মচারী। বিশ্বাসভাজন

হয়ে চল্লে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে আমরাই আপনাকে রক্ষা করবো। যে খবরটা আমি চাইছি, ওটা সরবরাহ করতে আপনি প্রস্তুত থাকলে আপনার সংগে অদৃশ্য কালি দেওয়া হবে। তার সাহায্যে আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখে সব খবর জানাতে পারবেন।

প্রলোভন আকর্ষণ করেছিল পত্রোসিনিওকে। ওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের ছটি ঠিকানায় সাধারণ নির্দোষ চিঠি লিখে চিঠির লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য কালিতে সৈন্য-চলাচলের সংবাদগুলি লিখে দিতে। ছ' সপ্তাহ পরে সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফ্রাংকফুর্ট-অন-মেইনে চিঠি লিখে তার উপস্থিতির সংবাদ জানাবার কথা ছিল। তার প্রেরিত সংবাদের মূল্য নিরূপণ করে তাকে পারিশ্রমিকও দেওয়া হতো। আর ওর বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হলে ওকে অন্য কাজেও নিয়োগ করা হতো। পত্রোসিনিওর রুমালে অদৃশ্য কালির আরক ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, প্রয়োজনের সময় রুমালটা জলে ভিজালেই কালি তৈরী হতো।

বন্দরে পদার্পন করামাত্রই পত্রোসিনিও নার্ভাস হয়ে সব কথা খুলে বলেছিল। সে জন্য ওকে মাত্র সতর্ক করে দিয়ে ব্রেজিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডের গোয়েন্দাবিভাগ জানতে পারে যে এ্যাডল্‌ফো গুয়েরিরো নামক একজন ভদ্রযুবক জার্মান তাঁবেদাররূপে ইংল্যাণ্ডে আসছে। যুবকটীকে নজরে রাখার অভিপ্রায়ে পোর্টের কর্ত্তৃপক্ষ জাহাজ থেকে ওর অবতরণের সময় কোনো বাধা দেয় নি। যুবকটী নিজের পরিচয় দিয়েছিল এই বলে সে মাদ্রিদের লিব্যারাল সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। যুবকটী একবর্ণও ইংরেজী বলতে পারে না দেখে পোর্ট কর্ত্তৃপক্ষ অবাক হয়ে গিয়েছিল। জার্মানরা ইংরেজী অনভিজ্ঞ এই ধরণের লোককে কোন্ যুক্তিতে তাদের অভিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল

বোঝা দুষ্কর। গুয়েরিয়োর সংগে প্যারী অবধি ছিল একজন পেশাদার নাচিয়ে যুবতী। গুয়েরিয়ো নর্তকীটীকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হলো। ওর পরামর্শে ফেঞ্চার্চ স্ট্রীটের এক স্পেনিশ ব্যবসায়ী মেয়েটীকে তার অফিসের কেরানীর পদের জন্য নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কারুর মাথায়ই ঢুকলো না যে ঘাঘরাপরা নর্তকী মেয়ের দ্বারা আর যাই হোক কলম পেশার কাজ চলতে পারে না। অবশ্য ফরাসী পাশপোর্ট অফিসের পক্ষে ব্যবস্থাটা ভালোই লেগেছিল। তাই পোর্টে মেয়েটী যখন বল্ল যে সে তার ভাবী স্বামী গুয়েরিয়োর সংগে মিলিত হবার জন্য এসেছে, তখন তাকে আটক করা হলো এই কারণে যে পাশপোর্টের ব্যাপারে ওকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল সে তার মিথ্যা জবাব দিয়েছিল। গুয়েরিয়োকেও গ্রেপ্তার করা হলো। সে কৈফিয়ৎ দিয়েছিল, লিব্যারাল কাগজের সংবাদদাতারূপে প্রবন্ধ পিছু দু পাউণ্ড আয়ের ওপর ভিত্তি করে ইংল্যাণ্ডে এসেছে। এবং প্রবন্ধ লেখার আয় থেকেই ওদের জীবিকা-নির্বাহ হবে। কিন্তু দেখা গেল ষোল দিনের মধ্যে সে প্রবন্ধ লিখেছিল মাত্র দুটো।

উপরোক্ত হাস্যকর কৈফিয়তে পুলিশ সন্তুষ্ট না হয়ে গুয়েরিয়োর যথার্থ পরিচয় নিরূপণ করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসাররা স্পেনে তদন্ত করার পর জানলেন, ছেলেটা ভদ্র পরিবারের, কিন্তু স্বভাব ভালো না হওয়ায় স্পেনস্থ জার্মান গুপ্তচরদের পাল্লায় পড়ে সহজেই তাদের হাতের পুতুল হয়ে উঠেছে। লিব্যারাল কাগজের সম্পাদক তাকে চেনেন না। জুলাই মাসের মাঝামাঝি ওল্ড বেইলী কোর্টে ওর বিচার শুরু হলো। অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় গুয়েরিয়োর বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ওর সহচরীর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না থাকায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বিচার শুরু হবার কয়েকদিন পর গুয়েরিয়ো জানায়, তাকে মার্জনা

করা হলে সে এমন কতগুলি তথ্য প্রকাশ করবে, যাতে জার্মান গুপ্তচরদের সমগ্র প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু ওর স্বীকৃতির মধ্যে পাওয়া গেল কাল্পনিক কাহিনীর সমাবেশ। সে বলেছিল, জার্মান সিক্রেট সার্ভিসে ওর নাম ভিক্টর গুনানটাস বা ১৫৪ নম্বর। ইংল্যাণ্ডের পোর্টগুলি থেকে যেসব জাহাজ ছাড়বে, সেগুলির খবর পাঠাবার জন্যই সে এসেছে। মতলবটা হলো জার্মান ডুবোজাহাজগুলির শিকার-সংগ্রহ। এ-কাজে তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত ছিল সাপ্তাহিক পঞ্চাশ পাউণ্ড ও পরিবেশিত সংবাদ অনুযায়ী নিমজ্জিত জাহাজ পিছু কমিশন। চরম দণ্ডই যোগ্য শাস্তি ছিল গুয়েরিরোর কিন্তু স্পেনের প্রভাবশালী মহলের চাপে পড়ে স্পেন সরকার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করলে ওকে মার্জনা করা হয়।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারেন যে সৈন্য চলাচলের সংবাদ ছাড়াও জার্মানরা ব্রিটেনের অস্ত্র-কারখানাগুলোর অবস্থিতি-স্থল জানবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। আরেকটা বিষয়েও ওরা উদ্বিগ্ন ছিল। ব্রিটিশ জাতির মনোবল ঐ সময়ে কোন্ পর্যায়ে আছে সেটা জানা তাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ সম্পর্কে যথার্থ রিপোর্ট পাবার জন্য ওরা লিওপোল্ড ভিইয়েরা নামের এক ডাচ ইহুদিকে দৈনিক ৫০ শিলিং হারে বেতন নির্দিষ্ট করে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিশ লোকটাকে স্বচ্ছন্দে বন্দরে নামতে দিয়ে ওর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখে। এর পর একদিন জানা গেল লোকটা হল্যাণ্ডে ব্লুম নামের কারুর সংগে পত্রালাপ করছে। ১৯১৬ সালের জুলাইতে ব্লুমকে সে লিখেছিল হল্যাণ্ডে ফিরে যাচ্ছে। ব্লুম তাকে জানিয়েছিল লণ্ডনে সুবিধা না হলে ইংল্যাণ্ডের প্রদেশগুলোতে চেষ্টা করতে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ব্লুমের ঠিকানায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেখানে

মিসেস্ ডিকার ছাড়া আর কাকেও দেখতে পেলেন না। পরবর্তী তদন্তে জানা গিয়েছিল মিসেস্ ডিকারের প্রাক-বিবাহ নাম ছিল সোফিয়া ব্লুম। তার ঠিকানাটা জার্মান সিক্রেট এজেন্টদের চিঠি পত্রের ডাক-বাক্সরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভিইয়েরাকে গ্রেপ্তার করে তার ঘরে তল্লাসী করতেই অদৃশ্য কালির সরঞ্জামাদি আবিষ্কৃত হলো। কড়া জেরার মুখে ব্লুমের সংগে ওর যোগাযোগের যথার্থ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হতে একটুও বিলম্বও হয়নি। বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ডের আদেশ হলেও সেটা বদলে ওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

জোসেফ মার্কসের কথাও উল্লেখযোগ্য। স্যর বেসিল একদিন বিকেলে টিলবারির ডাকঘরে অফিসারদের কার্যকলাপ দেখেছিলেন, সেই সময় একজন তাঁর কাছে এসে চুপিচুপি বল্ল, পাশের ঘরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটা লোককে আনা হয়েছে, আপনি একটু সাহায্য করবেন আসুন। স্যর বেসিল লোকটাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি লিখেছেন : লোকটা যখন ঘরে ঢুকলো, মনে হলো যেন মাংসের একটা পাহাড় এগিয়ে আসছে সামনে। ছ'ফুট লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া ও মোটা। অন্তত ষোল স্টোন ওজন তো হবেই। স্যর বেসিলের ধমকানিতে কাঁপতে থাকলো সেই মাংসস্তূপ। তারপর গড় গড় করে সব কিছু স্বীকার করতে লাগলো।

আঁয়-লা-শাপেলের নামকরা ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছিল লোকটা। জার্মানরা তাকে তিন তিনবার ফরাসীদের পক্ষে গুপ্তচরগিরির অপরাধে অভিযুক্ত করেছিল। জার্মানরা পরে বলেছিল, সে যদি জার্মানদের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সেখানকার নৌ-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে পাঠাতে পারে, তাহলে ফরাসীদের গুপ্তচর বলে তার ওপর যে সন্দেহ রয়েছে সেটা থাকবে না। অগত্যা স্বদেশবাসীর হাতে গুপ্তচরের মৃত্যুবরণ

করার চাইতে ইংল্যাণ্ডে পিতৃভূমির পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করতে আসাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল সে।

মার্কসের সংবাদ আদান-প্রদানের পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। সুইজার ল্যাণ্ডে বিভিন্ন দেশের ডাকটিকেট পাঠিয়ে সেগুনোর মারফৎ প্রয়োজনীয় তথ্য জানানোর নির্দেশ ছিল ওর প্রতি। বিভিন্ন ডাকঘরের ছাপমারা বিশেষ বিশেষ দেশেষ ডাকটিকিটের বিভিন্ন অর্থ নির্দিষ্ট ছিল। যেমন, এডিনবরার পোষ্ট-মার্ক দেওয়া দশটী উরুগুয়ে টিকেটের অর্থ করা হতো দশটী যুদ্ধজাহাজ ফার্থ অব ফোর্থে অবস্থান করছে। নির্দেশ পালন করার অভিপ্রায় মার্কসের কতখানি ছিল বোঝা যায়নি। তবে শক্রর সংগে যোগাযোগ রেখে ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করার অপরাধের বিচারে তার পাচ বছরের কারাদণ্ড ঘোষিত হলে সে মোটেই দুঃখিত হয় নি। অন্য আর কাউকেই ওর মত উৎফুল্ল হয়ে জেলে যেতে দেখেন নি স্যর বেসিল।

●জার্মানীর নারী গুপ্তচর

লিসা ব্লুম

মেরী পপোভিচ

ইভা বোর্ণভিলি

জার্মানীর নারী গুপ্তচর

রটারডামের এক জাহাজে লিসা ব্লুম নামের এক জার্মান মহিলা বার্সিলোনার জার্মান দূতাবাসে যাচ্ছিল। সংগে ছিল তার অনেক লট-বহর। সতেরোটা ট্রাংক বোঝাই ছিল মহার্ঘ কাপড়চোপড়ে। পরিচয় পাওয়া গেল দূতাবাসের কোনো কর্মচারীর গৃহকর্ত্রী বলে। সাধারণ কর্মচারীর গৃহকর্ত্রীর সংগে বিপুল পরিমাণ জিনিষপত্র ও মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ থাকায় স্বভাবতই সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের মনে। মাঝপথেই তাই জাহাজ থেকে নামানো হয়েছিল তাকে। ব্লুমের মুখ থেকে কোনো কথা পাওয়া না গেলেও ওর সংগিনী জানিয়েছিল, ব্লুম দূতাবাসের কৌন্সিলরের সংগে গোপন সম্পর্কে সম্পর্কিত। ব্লুমের বাক্সের মধ্যে ন'টী আয়রন-ক্রশ পাওয়া যায়, সেগুলি নাকি দূতাবাসের অফিসারদের কাছে পৌছে দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

ব্রিটিশ গোয়েন্দারা অনুমান করেছিলেন জার্মান গভর্ণমেণ্টের কোনো গোপন-বার্তা ব্লুম মৌখিকভাবে জানাবার জন্য যাচ্ছে। অগত্যা তাকে আটক করে রাখা ছাড়া উপস্থিত অন্য কোনো উপায় ছিল না ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে। ওর সংগিনী মহিলাকে অবশ্য গন্তব্যস্থলে যেতে দেওয়া হলো।

জার্মান গভর্ণমেণ্ট ব্যাপারটী নিঃশব্দে সহ্য করে নি। নিরপেক্ষ দুটী দেশের দূতাবাস মারফৎ কড়া প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্লুমের সম্ভাব্য চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেই জার্মানীর তরফ থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি।

১৯১৫ সালের শেষদিকে মাণ্টার ডাকঘরে অদ্ভুত একটী টেলিগ্রাম

এসেছিল। আপাতদৃষ্টে অর্থহীন শব্দমালার সমষ্টি বলে বোধ হলেও সেটী যে গুপ্ত বার্তা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ ছিল না। টেলিগ্রামটী পাঠিয়েছিল মাদাম-মেরী পপোভিচ বলে একজন সার্ব মহিলা। স্বাস্থ্যের কারণে তাকে মাণ্টায় আসতে হয়েছিল। মাদামকে কিন্তু অসুস্থা বা দুর্বলস্বাস্থ্য বলে একটুও মনে হতো না। কথাবার্তায় ছিল প্রগলভা। একটী বহু পুরোনো ডাচ ভাষার অভিধান তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল, তাতে কয়েকটী শব্দের নীচে দাগ দেওয়া ছিল। টেলিগ্রামেও ছিল শব্দ কটী। অভিধানটীর সাহায্যে টেলিগ্রামের সংকেত বার্তার রহস্যমোচন হতে পারে ভেবে যথাযথ পরীক্ষা করতেই দেখা গেল টেলিগ্রামে মাণ্টায় কয়েকটি ষ্টিমারের গমনাগমনের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। স্ত্রীলোকটীকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার উদ্দেশ্যে 'এইচ, এম, এস টেরিব্‌ল্‌' জাহাজে তুলে দেওয়া হলো। 'টেরিব্‌ল্‌' জাহাজের নামের মর্যাদা রক্ষা করেছিল মাদামের ব্যবহার। মাদামকে বশে রাখতে গিয়ে কাপ্তেন মহাসমস্যায় পড়েছিলেন। কাপ্তেন যখন জাহাজের খাদ্য সম্বন্ধে মাদামের অভিযোগ শোনার উদ্দেশ্যে তার কেবিনে ঢুকেছিলেন, জনশ্রুতি এই যে স্ত্রীলোকটী তখন হঠাৎ একটা মাংসের টুকরো তাঁর মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল।

স্যর বেসিলের বর্ণনা থেকে উধৃত করছি : স্ত্রীলোকটী তার মেজাজের এই রকম খ্যাতি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। ঐ সময় আমার সংগে আরো তিনজন অফিসার ছিলেন। মাদাম গট্‌ গট্‌ করে দৃপ্ত পদভরে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। তার চেহারা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রীলোকের চাইতে এই মহিলাটীই যেন সব চাইতে মোটা ও বেঁটে। নীচু আর্মচেয়ারে বসতেই সে যেন ডুবে গেল। চেহারা যাই হোক, সে যে মোটেই উপেক্ষার পাত্রী নয় একটু পরেই তা বুঝতে পারলাম।

ফরাসীভাষায় কথা বলেছিল মাদাম। প্রথমে আমাকে সম্বোধন করলো 'মঁসিয়ে' বলে, পরে আমি ওর কাছে হয়ে উঠলাম শুধু 'পুলিশম্যান'। পুরোনো ডাচ অভিধানটী কাছে রাখার কি উদ্দেশ্য ছিল তার জিজ্ঞাসা করতেই সম্বোধনের রূপান্তর ঘটেছিল। কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে এমন অনর্গল বাক্যধারা ছুটাতে লাগলো যে তাকে থামানো মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো। কথা বলবার সময় সে দম নেবার জন্যও থামছিল না। তার গলার আওয়াজ ক্রমশ এত চড়ে উঠেছিল যে দেওয়ালগুলো পর্যন্ত প্রতিধ্বনিতে কাঁপছিল। সেই সংগে তার উত্তেজনাও বেড়ে চলছিল। নীচু চেয়ারে বসে থাকা অসুবিধাজনক দেখে সে উঠে দাঁড়ালো এক সময়, তারপর চীৎকার ও হাত-পা ছোঁড়ার সংগে ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। শেষে এমন হলো যে খুব সামান্যের জন্যই তার চাপড়ানি থেকে বেঁচে যেতে লাগলো আমাদের মুখ আর গাল। গতিক খারাপ দেখে আমি ও আমার একজন অফিসার টেবিলের ওপর থেকে ছুরি, কলম, রুল ও এই ধরণের অন্যান্য অস্ত্রগুলো সরিয়ে তার হাতের নাগালের বাইরে রাখতে লাগলুম। ক্রমে তার উগ্রতা ও হস্ত-সঞ্চালন এমন বেড়ে উঠতে লাগলো যে আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লুম। মাদাম যতই আমাদের বাক্যবাণে বিধ্বস্ত করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগলো, আমরা ততই সরে যেতে লাগলুম। অবশেষে দেখতে পেলাম সে দাঁড়িয়ে আছে আমার টেবিলের গায়ে আর আমরা পা বাড়িয়েছি দরজার চৌকাঠে। আমাদের দ্বারা ওর বাক্যস্রোত বন্ধ করা অসম্ভব দেখে আমরা পরামর্শ করলাম স্ত্রীলোকটীকে অভিবাদন জানিয়ে সরে পড়ে এমন ব্যক্তিদের পাঠিয়ে দেওয়া যাক, যারা ওকে সহজেই ট্যাক্সিতে বসিয়ে দিতে পারবে। ট্যাক্সিতে তোলার সময় মাদাম স্নেহভরে যেমন ভাষাপ্রয়োগ করছিল, আমার মনে হয় না অফিসের

ঐ সব সুরক্ষিত ও স্তব্ধতায় মণ্ডিত করিডরগুলি আর কোনোদিন তা শুনেছে।...

মাদাম পপোভিচের মানসিক সুস্থতায় সন্দেহ থাকায় ডাক্তার দিয়ে তাকে পরীক্ষা করা হলো। ডাক্তাররা অভিমত দিলেন মাদামকে তখনই অভিযুক্ত করে বিচার করা সম্ভবপর হবে না। তাই যুদ্ধাবসান না হওয়া পর্যন্ত তাকে অন্তরীণ রাখার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। আইলস্‌বারীর কারাগারে মাদামকে আটক করে রাখা হলো। সেখানে ক্রমাগত খুঁটিনাটি বিষয়ে অভিযোগের পর অভিযোগ করে জেল-কর্তৃপক্ষকে সে যতদূর সম্ভব জ্বালাতন করতো। মাদাম পপোভিচকে অবশেষে উন্মাদ ঘোষণা করে চিকিৎসাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল।

জার্মানদের নিযুক্ত নারী-গুপ্তচরদের মধ্যে সম্ভবত সবচাইতে অকুশলী হচ্ছে ইভা বোর্ণভিলি। ফরাসী পিতামাতার সন্তান হলেও ইভা ছিল সুইডেনের অধিবাসিনী—ভাষাতত্ত্বে সুশিক্ষিতা। জীবনের কোনো সময়েই সে উন্নতি করতে পারে নি। প্রথমে বাল্‌টিক প্রদেশে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতো। তারপর কিছুকাল অভিনেত্রীর পেশা গ্রহণ করেছিল। এতেও তার সুবিধা না হওয়ায় এর পর কখনো সে বিদেশী দূতাবাস-গুলিতে মাঝে মাঝে সেক্রেটারী ও টাইপিষ্টের কাজ করেছে। ১৯১৫ সালের শরৎকালে, তখন তার কোনো কাজ ছিল না, সেসময় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় জার্মান গুপ্তচর-সংগ্রাহকদের খপ্পরে পড়ে অর্থলোভে সে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসে যোগদান করে।

এক স্কচ মহিলার সংগে পূর্বে থেকে আলাপ ছিল ইভা বোর্ণভিলির। তাকে ইভা চিঠি লিখে জানিয়ে দিল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সে ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে আসছে। সুইডিশ-পাশপোর্ট থাকায় তার ইংল্যাণ্ডে আসার কোনো বাধা ছিল না।

লণ্ডনে আসার পর ব্লুমসবারীর এক সস্তা হোটেলে উঠে ডাম্বারটনস্থিত তার পূর্বোক্ত বান্ধবীকে ইভা পত্র লিখে জানিয়েছিল, কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে সেন্সরশিপ অফিসে কাজের জন্য সে দরখাস্ত করবার মনস্থ করেছে, বান্ধবী যেন তাকে ইংরেজ বন্ধুদের সুপারিশ জোগাড় করে দেয়। স্কচ মহিলাটী হ্যাকনিতে কয়েকজন পরিচিতের ঠিকানা দিয়ে তাকে দেখা করতে বলে। বান্ধবীর নির্দেশিত স্থানে গিয়ে কারুরই দেখা না পেয়ে ইভা তার কার্ডে নাম ও ড্যানিশ লিগেশনের ঠিকানা লিখে চলে আসে। ড্যানিশ লিগেশনের মারফৎ তার টাকা আসার ব্যবস্থা থাকায় সে সেখানকার ঠিকানা উল্লেখ করেছিল। এরপর হ্যাকনির ভদ্রলোকদের কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে সে দেখা করতে যায়, কিন্তু প্রথম আলাপেই নব পরিচিতদের মনে অস্বস্তির ভাব এনে দেয়। শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধির দিক থেকে ইভা ছিল নির্বোধ। নবপরিচিত বন্ধু-পরিবারের সংগে প্রায়ই বেড়াতে যেতো সে। ইংল্যাণ্ডে সে সময় জার্মান জেপলিনের হামলা চল্‌ছে। ইভা বন্ধুদের বিমানাক্রমণ প্রতিরোধব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন করতো: সব চেয়ে নিকটে যে বিমান-বিধ্বংসী কামান আছে সেটা সে দেখতে পারে কি? কটা বিমানবিধ্বংসী কামান আছে লণ্ডনে? আকাশের কতদূর পর্যন্ত তার গোলা উঠতে পারে?

ফিন্‌স্‌বারী পার্কে বেড়াতে গিয়ে ইভা বলেছিল, এই ফিন্‌স্‌বারী পার্ক! এখানে যে কামান আছে শুনেছি, সেটা কোথায়?

হ্যাকনির বন্ধুদের সেন্সরসিপ অফিসে তার হয়ে সুপারিশ দেবার অনুরোধ করেছিল ইভা। তার ভাব-ভংগী দেখে অনুরোধটাকে এড়িয়ে গিয়ে বন্ধুরা বলেছিল, সেন্সর কাজের দায়িত্ব অনেক বেশী। তেমন কিছু ঘটলে আমরা সকলেই বিপদে পড়বো। শুনে সে বন্ধুদের কাছে

যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। বন্ধুদের স্মরণে ছিল ইভার কোনো একদিনের কথাগুলো : এখানে যা ঘটছে, জার্মানরা সমস্তই জানে। ওদের কাছে আপনারা কিছুই গোপন রাখতে পারবেন না।

কর্তৃপক্ষের নিয়মানুযায়ী ন্যূনতম সংখ্যক সন্তোষজনক পরিচিত ইংরেজ বান্ধব না থাকায় সেন্সরসিপের কাজ জোটাতে পারে নি ইভা। ব্লুমসবারী ছেড়ে সে সাউথ কেনসিংটনে চলে যায়। কিছুদিন পরে ফিরে এসে আপার বেডফোর্ড প্লেসের এক প্রাইভেট হোটেলে আস্তানা নিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা ছুটিতে ফুর্তি করতে আসতো সেখানে। ইভা সৈনিকদের সাথে আলাপ করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাদের উত্ত্যক্ত করতো।

যেটুকু তথ্য সে এইভাবে সংগ্রহ করেছিল তা মোটেই মূল্যবান ছিল না। তবু সে নিয়মিত পত্র মারফৎ সেগুলো লিখে পাঠাতো। ডাকঘরে ওর লেখা এমনি অনেক চিঠি আটক করা ছিল। সব চিঠিগুলির হাতের লেখা এক দেখে পত্র লেখক যে একই ব্যক্তি এটুকু জানা ছাড়া তার ঠিকানা ও পরিচয় জানার কোন সুযোগই পাওয়া যায় নি প্রথমে। হঠাৎ একদিন ওর চিঠির মধ্যে আপার বেডফোর্ড হোটেলের নামোল্লেখ পেয়ে পুলিশ কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলো, কিন্তু হোটেলে তিরিশ জনেরও বেশী অধিবাসী থাকায় আসল গুপ্তচরকে সনাক্ত করা সময়সাপেক্ষ বলে অনুমিত হলো। যে অফিসারটীর ওপর এ বিষয়ে তদন্ত করার ভার পড়েছিল তিনি একটা সহজ উপায় উদ্ভাবন করলেন। সম্ভাব্য সন্দেহজনক কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তিনি তাদের সংগে অন্তরংগতা স্থাপন করে প্রত্যেককেই পৃথক ভাবে নবাবিষ্কৃত ভয়াবহ এক গোপন যুদ্ধাস্ত্রের গল্প শোনালেন। সবচাইতে অবিশ্বাস্য ও প্রায় অসম্ভব গল্পটী শোনানো হয়েছিল ইভাকে। আর পরের দিনই ডাকঘরে ওকে যেমনটী শোনানো

হয়েছিল সেই রকমটা গল্প লেখা চিঠি এসে হাজির হলো—চিঠির হস্তাক্ষর পূর্বের পাওয়া চিঠিগুলোর সংগে মিলে যেতেই সবগুলিই ইভার লেখা বলে বুঝতে পারা গেল। ইভাকে ১৯১৫ সালের ১৫ই নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমটা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। চিঠিগুলো ওকে দেখাতেই সে নার্ভাস হয়ে হয়ে পড়ে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চিঠির লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য কালির লেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল।

ইভা স্বীকারোক্তিতে বলেছিল: আপনারা বিশ্বাস না করলেও আমি মনে মনে আপনাদের পক্ষেই ছিলাম। ইংরেজ ও বেলজিয়ানদের আমার খুব ভালো লাগে। জার্মানরা আমার দু চোখের বিষ। ১৮৬৪ সালে ডেনমার্কের প্রতি ওরা যে ব্যবহার করেছিল, তা ভোলা যায় না। আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমটা ওদের আস্থা অর্জন করে পরে আপনাদের পক্ষে কাজ করবো।

সুইডেনের জার্মান মিলিটারী এ্যাটাচি ইভাকে মাসিক তিরিশ পাউণ্ড হারে বেতনের লোভ দেখিয়ে সিক্রেট সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। গ্রেপ্তারের সময় তার কাছে ঐ অংকের একটা চেকও পাওয়া গিয়াছিল। ১২ই জানুয়ারী ১৯১৬ তারিখে ওল্ড বেইলী কোর্টে ওকে অভিযুক্ত করা হয়। ওর প্রতি চরম দণ্ডের আদেশ হলেও স্ত্রীলোক বিধায় ওকে আইলস্‌বারীর কারাগারে বন্দী করে রাখা হয় [illegible] সালের ফেব্রুয়ারী মাস অবধি।